ভয়ংকর সুন্দর

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ভয়ংকর সুন্দর

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

লীদার নদীর তীরে

আর সবাই পাহাড়ে গিয়ে কত আনন্দ করে, আমাকে সারাদিন বসে থাকতে হয় গজ ফিতে নিয়ে। পাথর মাপতে হয়। ফিতের একটা দিক ধরে থাকেন কাকাবাবু, আর একটা দিক ধরে টানতে টানতে আমি নিয়ে যাই, যতক্ষণ না ফুরোয়।

আজ সকাল থেকে একটুও কুয়াশা নেই। ঝকঝক করছে আকাশ। পাহাড়গুলোর মাথায় বরফ, রোদ্দুর লেগে চোখ ঝলসে যায়। ঠিক মনে হয় যেন সোনার মুকুট পরে আছে। যখন রোদ্দুর থাকে না, তখন মনে হয়, পাহাড় চুড়োয় কত কত আইসক্রিম, যত ইচ্ছে খাও, কোনোদিন ফুরোবে না।

আমার ডাক নাম সন্তু। ভালো সুনন্দ রায়চৌধুরী। আমি বালিগঞ্জের তীর্থপতি ইনসটিটিউশানে ক্লাস এইট-এ পড়ি। আমার একটা কুকুর আছে তার ডাক নাম রকু। ওর ভালো নামও অবশ্য আছে একটা। ওর ভালো নাম রকুকু। আমার ছোটমাসীর বাড়িতে একটা পোষা বিড়াল আছে। আমি সেটার নাম রেখেছি লড়াবি। আমি ওকে তেমন ভালবাসি না, তাই ওর ডাক নাম নেই। আমার কুকুরটাকে সঙ্গে আনতে পারিনি বলে মাঝে মাঝে আমার মন খারাপ হয়। আমি গত বছর ফাইনাল পরীক্ষায় সেকেণ্ড হয়েছি, কিন্তু স্পোর্টসে চারটে আইটেমে ফার্স্ট হয়েছিলুম। কাকাবাবু এই জন্য আমাকে খুব ভালবাসেন।

আজ চমৎকার বেড়াবার দিন। কিন্তু আজও সকালবেলা কাকাবাবু বললেন, চলো সন্তু, আজ সোনমার্গের দিকে যাওয়া যাক। ব্যাগ দুটোতে সব জিনিসপত্তর ভরে নাও!

আমি জিগ্যেস করলাম, কাকাবাবু, সোনমার্গে তো আগেও গিয়েছিলাম। আবার ওখানেই যাবো?

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, ঐ জায়গাটাই বেশী ভালো। ঐখানেই কাজ করতে হবে।

আমি একটু মন খারাপ করে বললাম, কাকাবাবু, আমরা শ্রীনগর যাবো না?

কাকাবাবু চশমা মুছতে মুছতে উত্তর দিলেন, না, না, শ্রীনগরে গিয়ে কী হবে? বাজে জায়গা। খালি জল আর জল! লোকজনের ভিড়!

আজ চোদ্দ দিন হলো আমরা কাশ্মীরে এসেছি। কিন্তু এখনও শ্রীনগর দেখিনি। একথা কেউ বিশ্বাস করবে? আমাদের ক্লাসের ফার্স্টবয় দীপঙ্কর ওর বাড়ির সবার সঙ্গে গত বছর বেড়াতে এসেছিল কাশ্মীরে। দীপঙ্করের বাবা বলে রেখেছেন, ও পরীক্ষায় ফার্স্ট হলে, ওকে প্রত্যেকবার ভালো ভালো জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাবেন। সেইজন্যই তো দু' নম্বরের জন্য সেকেন্ড হয়েও আমার দুঃখ হয়নি। কাশ্মীর থেকে ফিরে গিয়ে দীপঙ্কর কত গল্প বলেছিল। ডাল হ্রদের ওপর কতরকমের সুন্দর ভাবে সাজানো বড় বড় নৌকো থাকে। ওখানে সেই নৌকোগুলোর নাম হাউস বোট। সেই হাউস বোটে থাকতে কী আরাম। রাত্তিরবেলা যখন সব হাউস বোটে আলো জ্বলে ওঠে তখন মনে হয় জলের ওপর মায়াপুরী বসেছে। শিকারা নামে ছোট ছোট নৌকো ভাড়া পাওয়া যায়, তাইতে চড়ে যাওয়া যায় যেখানে ইচ্ছে সেখানে। মোগল গার্ডেনস, চশমাসাহী, নেহেরু পার্ক— এইসব জায়গায় কী ভালো ভালো সব বাগান।

দীপঙ্করের কাছে গল্প শুনে আমি ভেবেছিলাম যে শ্রীনগরই বুঝি কাশ্মীর। এবার কাকাবাবু যখন কাশ্মীরে আসবার কথা বললেন, তখন কী আনন্দই যে হয়েছিল আমার! কিন্তু এখনো আমার কাশ্মীরের কিছুই প্রায় দেখা হলো না। চোদ্দ দিন কেটে গেল। কাকাবাবুর কাছে শ্রীনগরের নাম বললেই উনি বলেন, ওখানে গিয়ে কি হবে? বাজে জায়গা! শুধু জল! জলের ওপর তো আর ফিতে দিয়ে মাপা যায় না। তাই বোধহয় কাকাবাবুর পছন্দ নয়। সত্যি কথা বলতে কি, কেন যে কাকাবাবু ফিতে দিয়ে পাহাড় মাপছেন তা আমি বুঝতে পারি না।

অবশ্য এই পহলগ্রাম জায়গাটাও বেশ সুন্দর। কিন্তু যে-জায়গাটা এখনও দেখিনি, সেই জায়গাটাই কল্পনায় বেশী সুন্দর লাগে। পহলগ্রামে বরফ মাখা পাহাড়গুলো এত কাছে যে মনে হয় এক দৌড়ে চলে যাই। একটা ছোট্ট নদী বয়ে গেছে পহলগ্রাম দিয়ে। ছোট হলেও নদীটার দারুণ স্রোত, আর জল কী ঠাণ্ডা!

পহলগ্রামে অনেক দোকানপাট, অনেক হোটেল আছে। এখান থেকেই তো তীর্থযাত্রীরা অমরনাথের দিকে যায়। অনেক সাহেব-

মেমেরও ভিড়। যারা আগে শ্রীনগর ঘুরে পহলগ্রামে এসেছে, তাদের মধ্যে অনেকে বলে যে শ্রীনগরের থেকে পহলগ্রাম জায়গাটা নাকি বেশী সুন্দর। কিন্তু আমি তো শ্রীনগর দেখিনি, তাই আমার ঠিক বিশ্বাস হয় না। শ্রীনগরের মতন এখানে তো হাউস বোট নেই। আমরা কিন্তু এখানেও হোটেলে থাকি না। আমরা থাকি নদীর এপারে, তাঁবুতে! এই তাঁবুতে থাকার ব্যাপারটা আমার খুব পছন্দ। দীপঙ্কররা শ্রীনগরে জলের ওপর হাউস বোটে ছিল, কিন্তু ওরা তো তাঁবুতে থাকেনি! দমদমের ভি-আই-পি রোড দিয়ে যেতে যেতে কতদিন দেখেছি, মাঠের মধ্যে সৈন্যরা তাঁবু খাটিয়ে আছে। আমারও খুব শখ হতো তাঁবুতে থাকার।

আমাদের তাঁবুটা ছোট হলেও বেশ ছিমছাম। পাশাপাশি দুটো খাট, কাকাবাবুর আর আমার। রাত্তিরবেলা দু' পাশের পর্দা ফেলে দিলে ঠিক ঘরের মতন হয়ে যায়। আর একটা ছোট ঘরের মতন আছে এক পাশে, সেটা জামাকাপড় ছাড়ার জন্য। অনেকে তাঁবুতে রান্না করেও খায়, আমাদের খাবার আসে হোটেল থেকে। তাঁবুতে শুলেও খুব বেশী শীত করে না আমাদের, তিনখানা করে কম্বল গায়ে দিই তো! ঘুমোবার সময়েও পায়ে গরম মোজা পরা থাকে। কোনো কোনো দিন খুব বেশী শীত পড়লে আমরা কয়েকটা হট ওয়াটার ব্যাগ বিছানায় নিয়ে রাখি। কত রাত পর্যন্ত শুয়ে শুয়ে নদীর স্রোতের শব্দ শুনতে পাই। আর কী একটা রাত-জাগা পাখি ডাকে চি-আও! চি-আও!

মাঝে মাঝে অনেক রাত্তিরে তাঁবুর মধ্যে মানুষজনের কথাবার্তা শুনে ঘুম ভেঙে যায়। আমার বালিশের পাশেই টর্চ থাকে। তাড়াতাড়ি টর্চ জেলে দেখি। কাশ্মীরে চোর-ডাকাতের ভয় প্রায় নেই বললেই চলে। এখানকার মানুষ খুব অতিথিপরায়ণ। টর্চের আলোয় দেখতে পাই, তাঁবুর মধ্যে আর কেউ নেই। কাকাবাবু ঘুমের মধ্যে কথা বলছেন। কাকাবাবুর এটা অনেক দিনের স্বভাব। কাকাবাবু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কার সঙ্গে যেন তর্ক করেন। তাই ওঁর দু'রকম গলা হয়ে যায়। কথাগুলো আমি ঠিক বুঝতে পারি না, কিন্তু আমার এই সময় একটু ভয় ভয় করে। তখন উঠে গিয়ে কাকাবাবুর গায়ে একটু ঠেলা মারলেই উনি চুপ করে যান।

আমার একটু দেরিতে ঘুম ভাঙে। পরীক্ষার আগে আমি অনেক রাত জেগে পড়তে পারি, কিন্তু ভোরে উঠতে খুব কষ্ট হয়। আর

এখানে এই শীতের মধ্যে তো বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছাই করে না। কাকাবাবু খুব ভোরে উঠতে পারেন। আমি জেগে উঠেই দেখি, কাকাবাবুর ততক্ষণে দাড়ি কামানো, স্নান করা সব শেষ। বিছানা থেকে নেমেই আমি তাঁবুর মধ্যে লাফালাফি দৌড়োদৌড়ি শুরু করি। তাতে খানিকটা শীত কাটে। আজ সকালবেলা মুখ হাত ধুয়ে, চা-টা খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। তাঁবুতে থাকার একটা সুবিধে এই দরজায় তালা লাগানো হয় না। তাঁবুতে তো দরজাই থাকে না। দরজার বদলে শক্ত পর্দা, সেটা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখলেই হয়। আমাদের কোনো জিনিসপত্তর কোনোদিন চুরি হয়নি, কাশ্মীরে চোর নেই। অবশ্য ডাকাত আছে। সেটা আমরা পরে টের পেয়েছিলুম।

ছোট্ট ব্রীজটা পেরিয়ে চলে এলুম নদীর এদিকে। এই সকালেই রাস্তায় কত মানুষজনের ভিড়, কত রকম রং-বেরঙের পোষাক। যে-দেশে খুব বরফ থাকে, সে দেশের মানুষ খুব রঙীন জামা পড়তে ভালোবাসে। ঝাঁক ঝাঁক সাহেব মেম এসেছে আজ। ঘোড়াওয়ালা ছেলেরা ঘোড়া ভাড়া দেবার জন্য সবাই এক সঙ্গে চিল্লামিল্লি করছে। আমরা কিন্তু এখন ঘোড়া ভাড়া নেব না। আমরা বাসে করে যাবো সোনমার্গ। তারপর সেখান থেকে ঘোড়া ভাড়া নিয়ে পাহাড়ে উঠবো।

কাকাবাবুর ঘোড়ায় চড়তে খুব কষ্ট হয়। তাই আমরা ঘোড়ায় বেশী চড়ি না। প্রথম ক'দিন আমাদের একটা জিপ গাড়ি ছিল। এখানকার গভর্নমেণ্ট থেকে দিয়েছিল। গভর্নমেণ্টের লোকেরা কাকাবাবুকে খুব খাতির করেন। কিন্তু আমার কাকাবাবু ভারী অদ্ভুত। তিনি কোনো লোকের সাহায্য নিতে চান না। দু' তিন দিন বাদেই তিনি জিপ গাড়িটা ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমাকে তখন বলেছিলেন, সব জায়গায় তো গাড়ি যায় না। যে-সব জায়গায় গাড়ি যাবার রাস্তা নেই—সেখানেই আমাদের বেশী কাজ। খোঁড়া পা নিয়েই তিনি কষ্ট করে চড়বেন ঘোড়ায়। এই যাঃ, বলে ফেললাম! আমার কাকাবাবুকে কিন্তু অন্য কেউ খোঁড়া বললে আমার ভীষণ রাগ হয়। আমি তো শুধু একবার মনে মনে বললাম। কাকাবাবু তো জন্ম থেকেই খোঁড়া নন্। মাত্র দু'বছর আগে কাকাবাবু যখন আফগানিস্তানে গিয়েছিলেন তখন কাবুলের থেকে খানিকটা দূরে ওঁর গাড়ি উল্টে যায়। তখনই একটা পা একেবারে চিপ্সে ভেঙে গিয়েছিল।

কাকাবাবুকে এখন ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটতে হয়। এখন আর
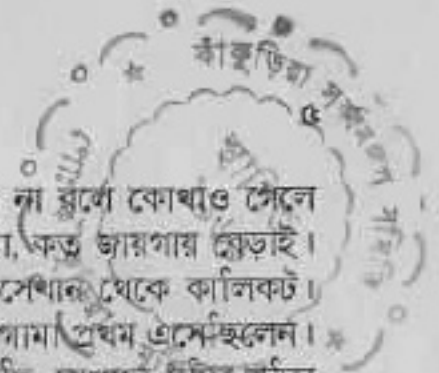
একলা একলা নিজে সব কাজ করতে পারেন না বলে কোথাও গেলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান। আমারও বেশ মজা, কত জায়গায় ঘুরি। গত বছর পুজোর সময় গিয়েছিলাম মথুরা, সেখান থেকে কালিকট। হ্যাঁ, সেই কালিকট বন্দর, যেখানে ভাস্কো-ডা-গামা প্রথম এসেছিলেন। ইতিহাসে-ভূগোলে যে-সব জায়গার নাম পড়েছি, সেখানে সত্যি সত্যি কোনোদিন বেড়াতে গেলে কী রকম যে অদ্ভুত ভালো লাগে, কী বলবো!

আগে চাকরি করার সময় কাকাবাবু যখন বাইরে বাইরেই ঘুরতেন, তখন আমরা ওঁকে বেশী দেখতে পেতাম না। চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর উনি কলকাতায় আমাদের বাড়িতে থাকেন। বই পড়েন দিনরাত, আর বছরে একবার দুবার নানান ঐতিহাসিক জায়গায় বেড়াতে যান—তখন আমাকে নিয়ে যান সঙ্গে। কাশ্মীরে এর আগেও কাকাবাবু দু' তিন বার এসেছেন—এখানে অনেকেই চেনেন কাকাবাবুকে।

ক্রাচে ভর দিয়েও কাকাবাবু কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারেন। দু' হাতে দুটো ব্যাগ নিয়ে আমি পাল্লা দিতে পারি না। এত তাড়াতাড়ি এসেও কিন্তু আমরা বাস ধরতে পারলুম না। সোনমার্গ যাবার প্রথম বাস একটু আগে ছেড়ে গেছে। পরের বাস আবার একঘণ্টা বাদে। অপেক্ষা করতে হবে।

কাকাবাবু কিন্তু বিরক্ত হলেন না। আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, কী সন্তু, জিলিপি হবে নাকি?

আমি লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করলুম। কাকাবাবু যে এক এক সময় মনের কথাটা ঠিক কী করে বুঝতে পারেন! পহলগ্রামে যারা বেড়াতে যায়নি, তারা বুঝতেই পারবে না, এখানকার জিলিপি'র কী অপূর্ব স্বাদ! খাঁটি ঘিয়ে ভাজা মস্ত বড় মৌচাক সাইজের জিলিপি। টুসটুসে রসে ভর্তি, ঠিক মধুর মতন। ভেজাল ঘি কাশ্মীরে যায় না, ডালডা তো বিক্রিই হয় না।

সোনার খোঁজে, না গন্ধকের খোঁজে?

বাস স্ট্যাণ্ডের কাছেই সোহনপালের বিরাট মিষ্টির দোকান। ভেতরে চেয়ার টেবিল পাতা, দেয়ালগুলো সব আয়না দিয়ে মোড়া। খাবারের দোকানের ভেতরে কেন যে আয়না দেওয়া বুঝি না। খাবার

তাকিয়ে দেখি আমাদের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন বিশাল চেহারার মানুষ। চিনি এ'কে, নাম সুচা সিং।

খাওয়ার সময় নিজের চেহারা দেখতে কারুর ভালো লাগে নাকি? জিলিপিতে কামড় বসাতেই হাত দিয়ে রস গড়িয়ে পড়লো।

কাকাবাবু নিজে খুব কম খান, কিন্তু আমার জন্য তিন চার রকমের খাবারের অর্ডার দিয়েছেন। এক ঘণ্টা সময় কাটাতে হবে তো! কাশ্মীরে এসে যতই পেট ভরে খাও, একটু বাদেই আবার খিদে পাবে। এখানকার জলে সব কিছু তাড়াতাড়ি হজম হয়ে যায়।

—কী প্রোফেসার সাহেব, আজ কোনদিকে যাবেন?

তাকিয়ে দেখি আমাদের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন বিশাল চেহারার মানুষ। চিনি এ'কে, নাম সুচা সিং। প্রায় ছ' ফিট লম্বা, কব্জি দুটো আমার উরুর মতন চওড়া, মুখে সুবিন্যস্ত দাড়ি। সুচা সিং এখানে অনেকগুলো বাস আর ট্যাক্সির মালিক, খুব জবরদস্ত ধরনের মানুষ। কী কারণে যেন উনি আমার কাকাবাবুকে প্রোফেসার বলে ডাকেন, যদিও কাকাবাবু কোনোদিন কলেজে পড়াননি। কাকাবাবু আগে দিল্লিতে গভর্নমেন্টের কাজ করতেন।

এখানে একটা কথা বলে রাখি। কাশ্মীরে এসে প্রথম কয়েকদিনই অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছিলুম, এখানে অনেকেই ভাঙা ভাঙা বাংলা বলতে পারে। বাংলাদেশ থেকে এত দূরে, আশ্চর্য ব্যাপার, না? কাকাবাবুকে জিগ্যেস করেছিলুম এর কারণ। কাকাবাবু বলেছিলেন, ভ্রমণকারীদের দেখাশোনা করাই তো কাশ্মীরের লোকদের প্রধান পেশা। আর ভারতীয় ভ্রমণকারীদের মধ্যে বাঙালীদের সংখ্যাই বেশী—বাঙালীরা খুব বেড়াতে ভালোবাসে—তাই বাঙালীদের কথা শুনে শুনে এরা অনেকেই বাংলা শিখে নিয়েছে। যেমন, সাহেব মেম অনেক আসে বলে এরা ইংরাজিও জানে বেশ ভালোই। এখানেই একটা ঘোড়ার সহিসকে দেখেছি, বাইশ-তেইশ বছর বয়েসে, সে কোনো দিন ইস্কুলে পড়েনি, নিজের নাম সই করতেও জানে না—অথচ ইংরেজী, বাংলা, উরদু বলে জলের মতন।

সুচা সিং ভাঙা ভাঙা উরদু আর বাংলা কথা মিলিয়ে বলেন। কিন্তু উরদু তো আমি জানি না, তন্দুরস্তি, তাকাল্লুফ এই জাতীয় দু' চারটে কথার বেশী শিখতে পারিনি—তাই ওর কথাগুলো আমি বাংলাতেই লিখবো।

কাকাবাবু সুচা সিংকে পছন্দ করেন না। লোকটির বড্ড গায়ে পড়া ভাব আছে। কাকাবাবু একটু নির্লিপ্তভাবে বললেন, কোনদিকে যাবো ঠিক নেই। দেখি কোথায় যাওয়া যায়!

সুচা সিং চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে বললেন, চলুন, কোনদিকে যাবেন বলুন, আমি আপনাকে পৌছে দিচ্ছি!

কাকাবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, না, না, তার দরকার নেই। আমরা একটু কাছাকাছি ঘুরে আসবো।

—আমার তো গাড়ি যাবেই, নামিয়ে দেব আপনাদের।

—না, আমরা বাসে যাবো।

—সোনমার্গের দিকে যাবেন তো বলুন। আমার একটা ভ্যান যাচ্ছে। ওটাতে যাবেন, আবার ফেরার সময় ওটাতেই ফিরে আসবেন।

প্রস্তাবটা এমন কিছু খারাপ নয়। সুচা সিং বেশ আন্তরিক ভাবেই বলছেন, কিন্তু পাত্তা দিলেন না কাকাবাবু। হাতের ভঙ্গি করে সুচা সিং-এর কথাটা উড়িয়ে দিয়ে কাকাবাবু বললেন, না, কোনো দরকার নেই।

কাকাবাবু যে সুচা সিংকে পছন্দ করছেন না এটা অন্য যে কেউ দেখলেই বুঝতে পারবে। কিন্তু সুচা সিং-এর সেদিকে কোনো খেয়ালই নেই। চেয়ারটা কাকাবাবুর কাছে টেনে এনে খাতির জমাবার চেষ্টা করে বললেন, আপনার এখানে কোনো অসুবিধা কিংবা কষ্ট হচ্ছে না তো? কিছু দরকার হলে আমাকে বলবেন!

কাকাবাবু বললেন, না, না, কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

—চা খাবেন তো? আমার সঙ্গে এক পেয়ালা চা খান্।

কাকাবাবু সংক্ষেপে বললেন, আমি চা খেয়েছি, আর খাবো না!

কাকাবাবু এবার পকেট থেকে চুরুট বার করলেন। আমি এর মানে জানি। আমি লক্ষ্য করেছি, সুচা সিং সিগারেট কিংবা চুরুটের ধোঁয়া একেবারে সহ্য করতে পারেন না। কাকাবাবু ওঁকে সরাবার জন্যই চুরুট ধরালেন। সুচা সিং কিন্তু তবু উঠলেন না—নাকটা একটু কুঁচকে সামনে বসেই রইলেন। তারপর হঠাৎ ফিসফিস করে জিগ্যেস করলেন, প্রোফেসার সাব, কিছু হদিস পেলেন?

কাকাবাবু বললেন, কী পাবো?

—যা খুঁজছেন এতদিন ধরে?

কাকাবাবু অপলকভাবে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সুচা সিং-এর দিকে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, না, কিছুই পাইনি। বোধহয় কিছু পাওয়া যাবেও না!

—তাহলে আর খোঁড়া পা নিয়ে এত তক্‌লিফ করছেন কেন?

—তবু খুঁজছি, কারণ খোঁজাটাই আমার নেশা।

—আপনারা বাঙালীরা বড় অদ্ভুত। আপনি যা খুঁজছেন, সেটা খুঁজে পেলে তা তো গভর্নমেণ্টেরই লাভ হবে। আপনার তো কিছু হবে না। তাহলে আপনি গভর্নমেণ্টের সাহায্য নিচ্ছেন না কেন? গভর্নমেণ্টকে বলুন, লোক দেবে, গাড়ি দেবে, সব ব্যবস্থা করবে—আপনি শুধু খবরদারি করবেন।

কাকাবাবু হেসে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লেন সুচা সিং-এর দিকে। তারপর বললেন, এটা আমার খেয়াল ছাড়া আর কিছু তো নয়! গভর্নমেণ্ট সব ব্যবস্থা করবে, তারপর যদি কিছুই না পাওয়া যায়, তখন সেটা একটা লজ্জার ব্যাপার হবে না?

—লজ্জা কি আছে, গভর্নমেণ্টের তো কত টাকারই শ্রাদ্ধ হচ্ছে; কম্পানিকা মাল, দরিয়ামে ডাল্!

কাকাবাবু আবার হেসে বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন সিংজী! বাঙালীরা অদ্ভুত জাত। তারা এসব পারে না।

সুচা সিং বললেন, বাঙালীদের আমাকে বলতে হবে না! আমি বহুৎ বাঙালী দেখেছি। ওদের মধ্যে বহুৎ ভালো ভালো মানুষ আছে, আবার খুব খারাপ, বদ্দি মানুষভি অনেক আছে। আপনাকে দেখেই বুঝেছি আপনি ভালো আদমি, কিন্তু একদম চালাক নন্!

একটা কথা আগে বলা হয়নি, কাকাবাবু কাশ্মীরে এসেছেন গন্ধকের খনি খুঁজতে। কাকাবাবুর ধারণা, কাশ্মীরের পাহাড়ের নিচে কোথাও প্রচুর গন্ধক জমা আছে। কাশ্মীর সরকারকে জানিয়েছেন সে কথা। সরকারকে না জানিয়ে তো কেউ আর পাহাড় পর্বত মাপা-মাপি করতে পারে না—বিশেষত কাশ্মীরের মতন সীমান্ত এলাকায়। আমি আর কাকাবাবু তাই গন্ধকের খনি আবিষ্কার করার কাজ করছি।

সুচা সিং বললেন, প্রোফেসারসাব, ওসব গন্ধক-টন্ধক ছাড়ুন। আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি, এখানে পাহাড়ের নিচে সোনার খনি আছে। সেটা যদি খুঁজে বার করতে পারেন—

কাকাবাবু খানিকটা নকল আগ্রহ দেখিয়ে বললেন, আপনি জানেন, এখানে সোনা পাওয়া যাবে?

—ডেফিনিটলি। আমি খুব ভালো ভাবে জানি।

—আপনি যখন জানেনই যে এখানে সোনা আছে, তাহলে আপনিই সেটা আবিষ্কার করে ফেলুন না!

—আমার যে আপনাদের মতন বিদ্যে নেই। ওসব খুঁজে বার করা

আপনাদের কাজ। আমি তো শুনেছি, টাটা কম্পানির যে এত বড় ইস্পাতের কারখানা, সেই ইস্পাতের খনি তো একজন বাঙালীই আবিষ্কার করেছিল!

কাকাবাবু চুরুটের ছাই ফেলতে ফেলতে বললেন, কিন্তু সিংজী, সোনার খনি খুঁজে পেলেও আপনার কী লাভ হবে! সোনার খনির মালিকানা গভর্নমেণ্টের হয়। গভর্নমেণ্ট নিয়ে নেবে।

সুচা সিং উৎসাহের চোটে টেবিলে ভর দিয়ে এগিয়ে এসে বললেন, নিক না গভর্নমেণ্ট! তার আগে আমরাও যদি কিছু নিতে পারি! আমি আপনাকে সাহায্য করবো। এখানে মুস্তফা বশীর খান বলে একজন বুড়ো আছে, খুব ইমানদার লোক। সে আমাকে বলেছে, মার্তণ্ডের কাছে তার ঠাকুর্দা পাহাড় খুঁড়ে সোনা পেয়েছিল।

—আপনিও সেখানে পাহাড় খুঁড়তে লেগে যান।

—আরে শুনুন, শুনুন, প্রোফেসারসাব—

কাকাবাবু আমার দিকে ফিরে বললেন, ওঠ্ সন্তু। আমাদের বাসের সময় হয়ে এসেছে! তোর খাওয়া হয়েছে?

আমি বললাম, হ্যাঁ। একটু জল খাবো।

—খেয়ে নে। ফ্লাস্কে জল ভরে নিয়েছিল তো?

তারপর কাকাবাবু সুচা সি-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার কি ধারণা, মাটির তলায় আস্ত আস্ত সোনার চাঁই পাওয়া যায়? পাথরের মধ্যে সোনা পাওয়া গেলেও তা গালিয়ে বার করা একটা বিরাট ব্যাপার। তাছাড়া সাধারণ লোক ভাবে সোনাই সবচেয়ে দামী জিনিস। কিন্তু তুমি ব্যবসা করো—তোমার তো বোঝা উচিত, অনেক জিনিসের দাম সোনার চেয়েও বেশী—যেমন ধরো কেউ যদি একটা পেট্রলের খনির সন্ধান পেয়ে যায়—সেটার দাম সোনার খনির চেয়েও কম হবে না। তেমনি, গন্ধক শুনে হেলাফেলা করছো, কিন্তু সত্যি সত্যি যদি প্রচুর পরিমাণে সালফার ডিপোজিটের খোঁজ পাওয়া যায়—

—সে তো হলো গিয়ে যদি-র কথা। যদি গন্ধক থাকে। কিন্তু আমি আপনাকে বলছি, কাশ্মীরে সোনা আছেই!

—তাহলে তুমি খুঁজতে লেগে যাও! আয় সন্তু—

সুচা সিং হঠাৎ খপ করে আমার হাত ধরে বললেন, কী খোকাবাবু, কোনদিকে যাবে আজ?

সুচা সিং-এর বিরাট হাতখানা যেন বাঘের থাবা, তার মধ্যে আমার

ছোট্ট হাতটা কোথায় মিলিয়ে গেছে। আমি উত্তর না দিয়ে কাকাবাবুর দিকে তাকালাম। কাকাবাবু বললেন, আজ আমরা দূরে কোথাও যাবো না, কাছাকাছিই ঘুরবো।

সুচা সিং আমাকে আদর করার ভঙ্গি করে বললেন, খোকাবাবুকে নিয়ে একদিন আমি বেড়িয়ে আনবো। কী খোকাবাবু, কাশ্মীরের কোন কোন জায়গা দেখা হলো? আজ যাবে আমার সঙ্গে? একদম শ্রীনগর ঘুরিয়ে নিয়ে আসবো!

শ্রীনগরের নাম শুনে আমার একটু একটু লোভ হচ্ছিল, তবু আমি বললাম, না।

সুচা সিং-এর হাত ছাড়িয়ে আমরা দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম। সুচা সিং-ও এলেন পেছনে পেছনে। আমরা তখন বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে না গিয়ে হাঁটতে লাগলাম অন্যদিকে।

কাকাবাবু সুচা সিংকে মিথ্যে কথা বলেছেন। আমরা যে আজ সোনমার্গে যাবো, তা তো সকাল থেকেই ঠিক আছে। কাকাবাবু সুচা সিংকে বললেন না সে কথা। গুরুজনরা যে কখনো মিথ্যে কথা বলেন না, তা মোটেই ঠিক নয়, মাঝে মাঝে বলেন। যেমন, আর একটা কথা, কাকাবাবু অনেককে বলেছেন বটে যে তিনি এখানে গন্ধকের খনি আবিষ্কার করতে এসেছেন—কিন্তু আমার সেটা বিশ্বাস হয় না। কাকাবাবু হয়তো ভেবেছেন, ছেলেমানুষ বলে আমি সব কিছু বিশ্বাস করবো কিন্তু আমি তো ততটা ছেলেমানুষ নই। আমি এখন ইংরিজি গল্পের বইও পড়তে পারি। কাকাবাবু অন্য কিছু খুঁজছেন। সেটা যে কী তা অবশ্য আমি জানি না। সুচা সিংও কাকাবাবুকে ঠিক বিশ্বাস করেননি। সুচা সিং-এর সরকারি মহলের অনেকের সঙ্গে জানাশোনা, সেখান থেকে কিছু শুনেই বোধহয় সুচা সিং সুযোগ পেলেই কাকাবাবুর সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করেন। সুচা সিং-এর কি ধারণা, কাকাবাবু গন্ধকের নাম করে আসলে সোনার খনিরই খোঁজ করছেন? আমরা কি সত্যিই সোনার সন্ধানে ঘুরছি?

সুচা সিং-এর দৃষ্টি এড়িয়ে আমরা চলে এসেছি খানিকটা দূরে। রোদ উঠেছে বেশ, পথে এখন অনেক বেশী মানুষ। আজ শীতটা একটু বেশী পড়েছে। আজ সুন্দর বেড়াবার দিন।

বাসের এখনও বেশ খানিকটা দেরি আছে। সুচা সিং-এর জন্য আমরা বাস ডিপোতে যেতেও পারছি না। আস্তে আস্তে হাঁটতে

লাগলাম উদ্দেশ্যহীন ভাবে। কাকাবাবু আপনমনে চুরুট টেনে যাচ্ছেন। আমি একটা পাথরের টুকরোকে ফুটবল বানিয়ে শুট্ দিচ্ছিলাম—

হঠাৎ আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, আরেঃ, স্নিগ্ধাদি যাচ্ছে না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই তো, স্নিগ্ধাদি, সিদ্ধার্থদা, রিণি—

কাকাবাবু জিগ্যেস করলেন, কে ওরা?

উত্তর না দিয়ে আমি চিৎকার করে ডাকলাম, এই স্নিগ্ধাদি!

এক ডাকেই শুনতে পেল। ওরাও আমাকে দেখে অবাক। এগিয়ে আসতে লাগলো আমাদের দিকে। আমি কাকাবাবুকে বললাম—কাকাবাবু, তুমি ছোড়দির বন্ধু স্নিগ্ধাদিকে দেখোনি?

উৎসাহে আমার মুখ জ্বলজ্বল করছে। এত দূরে হঠাৎ কোনো চেনা মানুষকে দেখলে কী আনন্দই যে লাগে। কলকাতায় থাকতেই অনেকদিন স্নিগ্ধাদিদের সঙ্গে দেখা হয়নি—আর আজ হঠাৎ এই কাশ্মীরে! বিশ্বাসই হয় না! কাকাবাবু কিন্তু খুব একটা উৎসাহিত হলেন না। আড়চোখে ঘড়িতে সময় দেখলেন।

স্নিগ্ধাদি আমার ছোড়দির ছেলেবেলা থেকে বন্ধু। কতদিন এসেছে আমাদের বাড়িতে। ছোড়দি-র বিয়ে হবার ঠিক এক মাসের মধ্যে বিয়ে হয়ে গেল স্নিগ্ধাদির। স্নিগ্ধাদির বিয়েতে আমি ধুতি পরে গিয়েছিলাম। আমার জীবনে সেই প্রথম ধুতি পরা। সিদ্ধার্থদাকেও আমরা আগে থেকে চিনি, ছোড়দিদের কলেজের প্রফেসার ছিলেন, আমাদের পাড়ার ফাংশনে রবীন্দ্রনাথের 'আফ্রিকা' কবিতাটা আবৃত্তি করেছিলেন। স্নিগ্ধাদির সঙ্গে সিদ্ধার্থদার বিয়ে হবার পর একটা মুস্কিল হলো। স্নিগ্ধাদিকে স্নিগ্ধা বৌদি বলে ডাকতে হয়, কিংবা সিদ্ধার্থদাকে জামাইবাবু। আমি কিন্তু তা পারি না। এখনো সিদ্ধার্থদা-ই বলি! আর, রিণি হচ্ছে স্নিগ্ধাদির বোন, আমারই সমান, ক্লাস এইট-এ পড়ে। পড়াশুনোয় এমনিতে ভালোই, কিন্তু অঙ্কে খুব কাঁচা। কঠিন অ্যালজেব্রা তো পারেই না, জিওমেট্রি এত সোজা—তাও পারে না। তবে, রিণি বেশ ভালো ছবি আঁকে।

স্নিগ্ধাদি কাছে এসে এক মুখ হেসে বললেন, কীরে সন্তু, তোরা কবে এলি আর কে এসেছে? মাসীমা আসেননি? বনানীও আসেনি?

আমি বললাম, ওঁরা কেউ আসেনি। আমি কাকাবাবুর সঙ্গে এসেছি।

কাকাবাবুর কথা শুনে ওরা তিনজনেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো কাকবাবুকে। চাকরি থেকে রিটায়ার করার আগে কাকাবাবু তো দিল্লিতেই থাকতেন বেশীর ভাগ—তাই স্নিগ্ধাদি দেখেননি আগে।

সিদ্ধার্থদা কাকাবাবুকে বললেন, আমি আপনার নাম অনেক শুনেছি। আপনি তো আরকিওলজিক্যাল সার্ভে-তে ডেপুটি ডাইরেকটর ছিলেন? আমার এক মামার সঙ্গে আপনার—

কাকাবাবুর কথাবার্তা বলার যেন কোনো উৎসাহই নেই। শুকনো গলায় জিগ্যেস করলেন, তুমি কী করো?

সিদ্ধার্থদা বললেন, আমি কলকাতার একটা কলেজে ইতিহাস পড়াই।

কাকাবাবু সিদ্ধার্থদার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, ইতিহাস পড়াও? তোমার সাবজেক্ট কি ছিল? ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি?

সিদ্ধার্থদা বিনীত ভাবে বললেন, হ্যাঁ। আমি বৌদ্ধ আমল নিয়ে কিছু রিসার্চ করেছি।

কাকাবাবু বললেন, ও, বেশ ভালো। আচ্ছা, তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই লাগলো। এবার আমাদের যেতে হবে। চল্ সন্তু—

সিদ্ধার্থদা বললেন, আপনারা কোনদিকে যাবেন? চলুন না, এক সঙ্গেই যাওয়া যাক।

আমি অধীর আগ্রহে কাকাবাবুর মুখের দিকে তাকালাম। কাকাবাবু যদি রাজী হয়ে যান, তাহলে কী ভালোই যে হয়! রোজই তো পাথর মাপামাপি করি, আজ একটা দিন যদি সবাই মিলে বেড়ানো যায়! তা ছাড়া, হঠাৎ স্নিগ্ধাদিদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

কাকাবাবু একটু ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বললেন, নাঃ, তোমরাই ঘুরে-টুরে দ্যাখো। পহলগাম বেশ ভালো জায়গা। আমরা অন্য জায়গায় যাবো, আমাদের কাজ আছে।

সিদ্ধার্থদা বললেন, তা হলে সন্তু থাক আমাদের সঙ্গে!

স্নিগ্ধাদি বললেন, সন্তু, তুই তো এখানে কয়েকদিন ধরে আছিস। তুই তা হলে আমাদের গাইড হয়ে ঘুরে-টুরে দ্যাখা। আমরা তো উঠেছি শ্রীনগরে, এখানে একদিন থাকবো—

আমি উৎসাহের সঙ্গে জিগ্যেস করলাম, স্নিগ্ধাদি, শ্রীনগর কী রকম জায়গা?

স্নিগ্ধাদি বললেন, কী চমৎকার, তোকে কি বলবো! এত ফুল, আর আপেল কি শস্তা? তোরা এখনো যাসনি ওদিকে?

—না!

—এত সুন্দর যে মনে হয় ওখানেই সারা জীবন থেকে যাই।

আমি একটু অহংকারের সঙ্গে বললাম, পহলগামও শ্রীনগরের চেয়ে মোটেই খারাপ নয়। এখানে কাছাকাছি আরও কত ভালো জায়গা আছে!

রিণি বললো, এই সন্তু, তুই একটু রোগা হয়ে গেছিস কেন রে? অসুখ করেছিল?

আমি বললাম, না তো!

—তা হলে তোর মুখটা শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে কেন?

—ভ্যাট! মোটেই না!

নদীটার দিকে আঙুল দেখিয়ে রিণি জিগ্যেস করলো, এই নদীটার নাম কি রে?

আমি বললাম, এটার নাম হচ্ছে লীদার নদী। আগেকার দিনে এর সংস্কৃত নাম ছিল লম্বোদরী। লম্বোদরী থেকেই লোকের মুখে মুখে লীদার হয়ে গেছে। আবার অমরনাথের রাস্তায় এই নদীটাকেই বলে নীল গঙ্গা।

স্নিগ্ধাদি হাসতে হাসতে বললেন, সন্তুটা কী রকম বিজ্ঞের মতন কথা বলছে! ঠিক পাকা গাইডদের মতন...

আমি বললাম, বাঃ, আমরা তো এখানে দু' সপ্তাহ ধরে আছি। সব চিনে গেছি। আমি একা একা তোমাদের সব জায়গায় নিয়ে যেতে পারি।

কাকাবাবু আবার ঘড়ি দেখলেন। আমার দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, সন্তু, তুমি কি তাহলে এদের সঙ্গে থাকবে? তাই থাকো না হয়—

আমি চমকে কাকাবাবুর দিকে তাকালাম। কাকাবাবুর গলার আওয়াজটা যেন একটু অন্য রকম। হঠাৎ আমার বুকের মধ্যে একটা কান্নাকান্না ভাব এসে গেল। কাকাবাবু নিশ্চয়ই আমার ওপরে অভিমান করেছেন। তাই আমাকে থাকতে বললেন। আমি তো জানি, খোঁড়া পা নিয়ে কাকাবাবু একলা একলা কোনো কাজই করতে পারবেন না। সাহায্যও নেবেন না অন্য কারুর।

আমি বললাম, কাকাবাবু, আমি তোমার সঙ্গেই যাবো।

কাকাবাবু তবু বললেন, না, তুমি থাকো না। আজ একটু বেড়াও ওদের সঙ্গে। আমি একলাই ঘুরে আসি।

আমি জোর দিয়ে বললাম, না, আমি তোমার সঙ্গেই যাবো!

কাকাবাবুর মুখখানা পরিষ্কার হয়ে গেল। বললেন, চলো তাহলে। আর দেরী করা যায় না।

আমি সিদ্ধার্থদাকে বললাম, আপনারা এখানে কয়েকদিন থাকুন না। আমরা তো আজ সন্ধেবেলাতেই ফিরে আসছি—

সিদ্ধার্থদা বললেন, আমরা কাল সকালবেলা অমরনাথের দিকে যাবো—

—সেই অমরনাথ মন্দির পর্যন্ত যাবেন? সে তো অনেকদিন লাগবে!

স্নিগ্ধাদি বললেন, ঐ রাস্তায় যাবো, যতটা যাওয়া যায়—খুব বেশী কষ্ট হলে যাবো না বেশীদূর। ফিরে এসে তোদের সঙ্গে দেখা হবে। তোরা কি এখানেই থাকছিস?

সিদ্ধার্থদা কাকাবাবুকে জিগ্যেস করলেন, আপনারা এখানে কতদিন থাকবেন?

কাকাবাবু বললেন, ঠিক নেই।

বাস এসে গেছে। আমি আর কাকাবাবু বাসে উঠে পড়লাম। চলন্ত বাসের জানলা দিয়ে দেখলাম, সিদ্ধার্থদা, স্নিগ্ধাদি আর রিণি হেঁটে যাচ্ছে লীদার নদীর দিকে। রিণি তরতরিয়ে নেমে গিয়ে নদীটার জলে পা ডোবালো।

আকাশ পুরোনো হয় না

সোনমার্গেও আজ বেশ ভিড়। প্রচুর লোক বেড়াতে এসেছে। বরফের ওপরে স্কেটিং করছে, লাফাচ্ছে, গড়াগড়ি দিচ্ছে অনেকে। বরফের ওপর লাফালাফি করার কী মজা, পড়ে গেলেও একটুও ব্যথা লাগে না, জামা কাপড় ভেজে না। এমনকি শীতও কম লাগে। এখানকার হাওয়াতেই বেশী শীত। একটা মেয়ে-স্কুল থেকে দল বেঁধে বেড়াতে এসেছে, এক রকম পোষাক পরা গোটা চল্লিশেক মেয়ে, কী হুড়োহুড়িই করছে সেখানে। আর দু'জন সাহেব মেম মুভি ক্যামেরায় ছবি তুলছে অনবরত।

আমরা অবশ্য ওদিকে যাবো না। আমাদের খেলাধুলো করার

সময় নেই। কাকাবাবু কাশ্মীরের ম্যাপ খুলে অনেকক্ষণ ধরে মনোযোগ দিয়ে দেখলেন। তারপর দুটো ঘোড়া ভাড়া করে আমাকে বললেন, চলো।

কাশ্মীরে এসে একটা লাভ হয়েছে, আমি বেশ ভালো ঘোড়ায় চড়তে পারি এখন! প্রথম দু' একদিন অবশ্য ভয় ভয় করতো, গায়ে কী ব্যথা হয়েছিল! এখন সব সেরে গেছে, এখন ঘোড়া গ্যালপ করলেও আমার অসুবিধে হয় না। প্রত্যেক ঘোড়ার সঙ্গেই একটা করে পাহারাদার ছেলে থাকে, আমি আমার সঙ্গের ছেলেটাকে ছাড়িয়ে অনেকদূর চলে যাই।

সেই নির্জন পাহাড়ের ওপর দিয়ে একলা একলা ঘোড়া চালাতে চালাতে নিজেকে মনে হয় ইতিহাসের কোনো রাজপুত্রের মতন। অন্য কারুকে অবশ্য এ কথাটা বলা যায় না, নিজের মনে মনেই ভাবি। যেন আমি কোন এক নিরুদ্দেশের দিকে যাত্রা করেছি।

প্রায় এক ঘন্টা ঘোড়া চালিয়ে আমরা একটা ছোট পাহাড়ের মাথায় এসে পৌঁছুলাম। এখানে কিছু নেই, সব দিক ফাঁকা, এদিকে ওদিকে থোকা থোকা বরফ ছড়ানো, মানুষজনের চিহ্নমাত্র নেই। তিনদিক ঘিরে আছে বিশাল বিশাল পাহাড়—মেঘ ফুঁড়ে আরও উঁচুতে উঠে গেছে তাদের চূড়া। এক দিকে ঢালু হয়ে বিশাল খাদ, অনেক নিচে দেখা যায় কিছু গাছপালা আর একটা গ্রামের মতন।

এই পাহাড়টাতেও আমরা আগে একবার এসেছি, দিন আষ্টেক আগে। পাহাড়টা বেশী উঁচু নয়, অনেকটা টিপির মতন—আরও দুটো পাহাড় পেরিয়ে এটায় আসতে হয়। দু' চারটে বেঁটে বেঁটে পাইন গাছ আছে এ পাহাড়ে—পাইন গাছগুলোর ওপর বরফ পড়ে আছে, ঠিক যেন বরফের ফুল ফুটেছে। এখানে আবার নতুন করে মাপামাপি করার কি আছে কে জানে। সব দিকেই তো শুধু বরফ ছড়ানো। বরফ না খুঁড়লে কী করে বোঝা যাবে নিচে কী আছে? আর এই বরফের নিচে কি গন্ধক পাওয়া সম্ভব? কিংবা সোনা?

কাকাবাবু ঘোড়াওয়ালা ছেলে দুটোকে ছুটি দিয়ে দিলেন। বললেন, বিকেলবেলা আসতে। ঘোড়া দুটো বাঁধা রইলো। আমাদের সঙ্গে স্যান্ডউইচ আর ফ্লাস্কে কফি আছে—আমাদের আর খাবার-দাবারের জন্য নিচে নামতে হবে না।

ক্রাচ দুটো নামিয়ে রেখে কাকাবাবু তার ওপর বসলেন। তারপর ওভারকোটের পকেট থেকে একটা হলদেটে, পোকায়-খাওয়া পুরোনো

বই বার করে দেখতে শুরু করলেন। আমাকে বললেন, সন্তু, তুমি ততক্ষণ চার পাশটা একটু দেখে নাও—একটু পরে কাজ শুরু করা যাবে।

আমার মন খারাপ ভাবটা তখনো যায়নি। একটু ক্ষুণ্ণ ভাবে বললাম, কাকাবাবু, এই জায়গাটা তো আগে দেখেছি। আজ আর নতুন করে কী দেখবো?

কাকাবাবু বই থেকে মুখ তুলে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন। তারপর খুব নরম গলায় বললেন, তোমার বুঝি খুব ইচ্ছে করছিল ঐ সিদ্ধার্থদের সঙ্গে বেড়াতে? তা তো হবেই, ছেলেমানুষ—

আমি থতমত খেয়ে বললাম, না, না, আমি কাজ করতেই চাই। এখন কাজ শুরু হবে না!

কাকাবাবু আমার গায়ে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, কোনো কাজ শুরু করার আগে সেই জায়গাটা খুব ভালো করে দেখে নিতে হয়। শোনো, দেখার জিনিসের কোনো শেষ নেই। কোনো জায়গাতে গিয়েই কখনো ভাববে না, দেখার কিছু নেই সেই জায়গায়। খোলা চোখ নিয়ে তাকালেই অনেক কিছু দেখতে পাবে। যেমন ধরো আকাশ। আকাশ কি কখনো পুরোনো হয়? কোনো মানুষে সারা-জীবনে এক রকমের আকাশ দু'বার দেখে না। প্রত্যেকদিন আকাশের চেহারা অন্যরকম। এই পাহাড়ও তাই। কখনো রোদ্দুর, কখনো ছায়া—অমনি পাহাড়গুলোর চেহারা বদলে যায় না? একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকো—তাহলেই বুঝতে পারবে।

আমি আকাশের দিকে তাকালাম। আকাশটা আজ সত্যিই খুব সুন্দর। হালকা তুলোর মতন মেঘ বেশ জোরে উড়ে যাচ্ছে। সেই মেঘগুলোর চেয়ে আরও উঁচুতে আবার ঘন কালো রঙের মেঘ—অথচ রোদ্দুরও হয়েছে। রিণিদের সঙ্গে যদি দেখা না হতো, বেড়াবার ইচ্ছেটা নতুন করে না জাগতো—তাহলে এই আকাশের দিকে তাকালে ভালোই লাগতো।

কাকাবাবু বইটা পড়তে লাগলেন, আমি পাহাড়ের উল্টোদিকে একটুখানি নেমে গেলাম। এখানে একটা ছোট্ট গুহা আছে। গুহার মুখটা বেশ বড়, কিন্তু বেশী গভীর নয়। আগে বইতে পাহাড়ের গুহার কথা পড়লেই মনে হতো, সেটা হবে অন্ধকার-অন্ধকার, বাদুড়ের গন্ধ আর হিংস্র পশুর বাসা। সেদিক থেকে এই গুহাটা

দেখলে নিরাশই হতে হয়। কাশ্মীরে হিংস্র জীবজন্তু বিশেষ নেই। গুহাটা বেশ ঝকঝকে তকতকে। এক জায়গায় একটা ভাঙা উনুন আর আগুনের পোড়া দাগ। মনে হয় এইখানে এক সময় কেউ ছিল। এতদূরে কেউ তো আর পিকনিক করতে আসবে না। বোধহয় কোনো সন্ন্যাসী এখানে এসে আস্তানা গেড়েছিল কোনো সময়।

গুহাটার মধ্যে একটু বসেছি অমনি বাইরে ঝুরঝুর করে বরফ পড়তে লাগলো। আমিও ছুটে বাইরে এলাম। বরফ পড়ার সময় ভারী মজা লাগে। ছেঁড়া ছেঁড়া তুলোর মতন হালকা বরফ, গায়ে পড়লেও জামাকাপড় ভেজে না—হাতে জমিয়ে-জমিয়ে শক্ত বলের মতনও বানানো যায়। বরফের মধ্যে খানিকটা দৌড়োদৌড়ি করে আমি শীত কমিয়ে নিলাম। তারপরে হাঁটু গেড়ে বসে গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ জমিয়ে মন্দির বানাতে লাগলাম একটা।

কাকাবাবুও নেমে এসেছেন। বললেন, এসো এবার কাজ শুরু করা যাক। খানিকটা কাজ করে তারপরে আমরা খেয়ে নেবো। তোমার খিদে পায়নি তো?

—না, এক্ষুনি কি খিদে পাবে!

—বেশ। ফিতেগুলো বার করো।

ব্যাগ দুটো আমি গুহার মধ্যে রেখেছিলাম। সেগুলো নিতে এলাম, কাকাবাবু আমার সঙ্গে সঙ্গে এলেন। গুহার চার পাশটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে বললেন, এই গুহাটা আমার বেশ পছন্দ। এইটার জন্যই এখানে আসি।

আমি হঠাৎ বলে ফেললাম, কাকাবাবু, আমরা এই গুহাটায় থাকতে পারি না? তাহলে বেশ মজা হবে!

কাকাবাবু বললেন, এখানে কি থাকা যায়? শীতে মরে যাবো। সামনেটা তো খোলা—যখন বরফের ঝড় উঠবে—

—কিন্তু সন্ন্যাসীরা তো এই রকম গুহাতেই থাকে!

—সন্ন্যাসীরা যা পারে, তা কি আমরা পারি? সন্ন্যাসীরা অনেক কষ্ট সহ্য করতে পারে।

কাকাবাবু ক্রাচ দিয়ে গুহার দেওয়াল ঠুকে ঠুকে দেখতে লাগলেন। চিন্তিতভাবে বললেন, এই গুহার কোনো জায়গা কি ফাঁপা হতে পারে? মনে তো হচ্ছে না।

আমি কিছু বললাম না। পাথর আবার কখনো ফাঁপা হয় নাকি?

কাকাবাবু আরও কিছুক্ষণ গুহাটা পরীক্ষা করলেন। মেঝেতে শুয়ে পড়ে ঠুকে ঠুকে দেখলেন। তারপর নিরাশ ভাবে বললেন, নাঃ, এখানে কিছু আশা নেই।

কাকাবাবু গুহাটার মধ্যে কি যে পাবার আশা করেছিলেন, তা-ও বুঝতে পারলাম না আমি।

আর সময় নষ্ট না করে আমরা মাপার কাজ শুরু করলাম। এই মাপার কাজটা ঠিক যে পর পর হয় তা নয়। কাকাবাবু ফিতের একটা দিক ধরে থাকেন, আর একটা দিক ধরে আমি নেমে যাই, যতক্ষণ না ফিতেটা শেষ হয়। সেখানে আমি পা দিয়ে একটা দাগ কাটি। কাকাবাবু সেখানেই দাঁড়িয়ে থেকে বলেন, এবার ডান দিকে যাও! ডানদিকটা হয়ে গেলে কাকাবাবু হয়তো বলেন, এবার বাঁ দিকে যাও অর্থাৎ, কাকাবাবু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেন, আমি চারদিকে ঘুরতে থাকি। তারপর কাকাবাবু আবার খানিকটা এগিয়ে যান, আমি আবার মাপতে শুরু করি!

সত্যি কথা বলতে কি, এরকমভাবে মাপার যে কোনো রকম কাজ হতে পারে তা আমার বিশ্বাস হয় না। অবশ্য আমি কতটুকুই বা বুঝি! আমি ক্লান্ত হয়ে যাই, কাকাবাবু কিন্তু ক্লান্ত হন না। দিনের পর দিন এইভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন। কলকাতায় ফেরার পর স্কুলের বন্ধুরা নিশ্চয়ই জিগ্যেস করবে এতদিন কাশ্মীরে থেকে কি করলি? আমি যদি বলি, আমি শুধু কাকাবাবুর সঙ্গে পাথর মেপে এলাম—তা হলে কেউ কি সে কথা বিশ্বাস করবে? কিংবা হয়তো হাসবে!

ঘণ্টা দু-এক বাদে আমরা একটু বিশ্রাম নেবার জন্য থামলাম। পাহাড়টার চূড়া থেকে আমরা অনেকটা নিচে চলে এসেছি। পাহাড়ের নিচের গ্রামটা এখন অনেকটা স্পষ্ট দেখা যায়। ছোট ছোট কাঠের বাড়ি, রুপোর তারের মতন একটা নদী।

কাকাবাবু বললেন, ডানদিকে দ্যাখো। উপত্যকা দেখতে পাচ্ছো?

ডানদিকে আর একটা খাড়া পাহাড়, তার নিচে ছোট্ট উপত্যকা। সেই উপত্যকায় অনেকটা বেশ পরিষ্কার জমি। ঠিক যেন একটা ফুটবল খেলার মাঠ। সেখানে কয়েকটা কী যেন জন্তু নড়াচড়া করছে। এত দূরে যে ভালো করে দেখা যায় না।

কাকাবাবু বললেন, ওগুলো কী জন্তু বুঝতে পারছো?

না, ঠিক বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে কুকুর। নাকি হরিণ

ওগুলো ? কাকাবাবুর কাছে সব সময় ছোট একটা দূরবীন থাকে। সেটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, ভালো করে দ্যাখো।

দূরবীন চোখে দিয়েই দেখতে পেলাম, কুকুর কিংবা হরিণ না, কতগুলো ঘোড়া সেই উপত্যকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আশেপাশে একটাও মানুষজন নেই।

আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, কাকাবাবু, ওগুলো কি বুনো ঘোড়া ? ওদের কখনো কেউ ধরেনি ?

কাকাবাবু বললেন, না। ঠিক তার উল্টো।

আমি অবাক হয়ে কাকাবাবুর দিকে তাকালুম। ঘোড়ার উল্টো মানে কি ? মেয়ে-ঘোড়া ? মেয়ে ঘোড়াকে কি ঘুড়ী বলে ? ঠিক জানি না। ইংরেজিতে বলে মেয়ার ?

—কাকাবাবু, ওগুলো কি তবে মেয়ার ?

কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, না, তা বলিনি। ওগুলো বুনো ঘোড়া নয়, ওগুলো বুড়ো ঘোড়া। চলতি বাংলায় যাকে বলে বেতো ঘোড়া।

—ওগুলো সব বুড়ো ঘোড়া ? এক সঙ্গে এত বুড়ো ঘোড়া কোথা থেকে এলো ? তুমি কী করে জানলে ?

—আমি আগেও দেখেছি। এই ব্যাপারটা শুধু কাশ্মীরেই দেখা যায়। এইগুলো হচ্ছে ঘোড়াদের কবরখানা। এই সব পাহাড়ী জায়গাতে তো বুড়ো ঘোড়া কোনো কাজে লাগে না, তাই ঘোড়াগুলো খুব বুড়ো হয়ে গেলে এই রকম উপত্যকায় ছেড়ে দেয়। ওখান থেকে উঠে আসতে পারবে না। ওখানেই আস্তে আস্তে মরে যায় একদিন!

—ইস, কী নিষ্ঠুর! কেন, বাড়িতে রেখে দিতে পারে না ?

—নিষ্ঠুর নয়! বাড়িতে রেখে দিলে তো খেতে দিতেও হয়। এরা গরিব মানুষ, কাজ না করিয়ে কি শুধু শুধু বসিয়ে কারুকে খাওয়াতে পারে ? তাই চোখের আড়ালে যাতে মরে যায়, তাই ছেড়ে দিয়ে আসে। নিজের হাতে মারতে হলো না। বুড়ো ঘোড়ার কোনো দাম নেই, কেউ কিনবেও না। এদেশে তো কেউ ঘোড়ার মাংস খায় না—তাহলে বাজারে বিক্রি হতে পারতো। ফ্রান্সে ঘোড়ার মাংস খায়—

ঘোড়াগুলো ওখানে থেকে মরার জন্য প্রতীক্ষা করছে—একথা ভেবেই আমার খুব কষ্ট হতে লাগলো। যতদিন ওরা মনিবের হয়ে খেটেছে ততদিন ওদের যত্ন ছিল। মানুষ বড় স্বার্থপর! মানুষও

তো খুব বুড়ো হয়ে গেলে আর কাজ করতে পারে না। তখন কি তাদের কেউ ওরকম ভাবে ছেড়ে দিয়ে আসে ?

আমি দূরবীনটা নিয়ে ভালো করে দেখতে লাগলাম। এবার দেখতে পেলাম, ঐ উপত্যকার এখানে-সেখানে অনেক হাড় ছড়িয়ে আছে। আগে যারা মরেছে। যে-ঘোড়াগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেগুলোও খুব রোগা রোগা। খাবার কিছুই নেই বোধহয়। ঘোড়ারা কি আসন্ন মৃত্যুর কথা বুঝতে পারে ?

কাকাবাবু বললেন, নাও, আবার কাজ শুরু করা যাক্‌।

আমি ফিতের বাক্স নিয়ে আবার উঠে দাঁড়ালাম।

এর পরেই একটা সাংঘাতিক ব্যাপার হয়ে গেল। কাকাবাবু তাড়াতাড়ি ওপরে ওঠার চেষ্টা করতেই বরফে ক্রাচ পিছলে গেল। কাকাবাবু মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে গেলেন।

কাকাবাবুকে ধরার জন্য আমি হাতের জিনিস ফেলে ছুটতে যাচ্ছিলাম; কাকাবাবু সেই অবস্থায় থেকেই আমাকে চেঁচিয়ে বললেন, এই সন্তু দৌড়োবি না! পাহাড়ের ঢালু দিকে দৌড়োতে নেই। আমি নিজেই উঠছি!

আমি থমকে দাঁড়ালাম। কাকাবাবু উঠে দাঁড়ালেন আস্তে আস্তে। ক্রাচটা নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিতে যেতেই আবার পড়ে গেলেন। এবার পড়েই গড়াতে লাগলেন নিচের দিকে।

প্রচণ্ড ভয় পেয়ে আমি চিৎকার করে উঠলাম। এবার আমি দৌড়োতেও সাহস পেলাম না। নিচের দিকে তাকিয়ে আমার মাথা ঘুরতে লাগলো। কাকাবাবু গড়িয়ে গড়িয়ে নিচে নেমে যাচ্ছেন—সেই ঘোড়াদের কবরখানার দিকে। কাকাবাবু দু'হাত দিয়ে প্রাণপণে কিছু একটা চেপে ধরার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ধরার কিছু নেই, একটা গাছ বা লতাপাতাও নেই। আমার বুকের মধ্যে ধক্‌ধক্‌ করতে লাগলো। কী হবে ? এখন কী হবে ? আমি একবার পাঁচ ছ'টা সিঁড়ি গড়িয়ে পড়েছিলাম মামার বাড়িতে...। কিন্তু এ তো হাজার হাজার সিঁড়ির চেয়েও নিচু...

খানিকটা দূরে গিয়ে কাকাবাবু থেমে গেলেন। সেখানেও গাছপালা কিছু নেই, কী ধরে কাকাবাবু থামলেন জানি না। থেমে গিয়ে কাকাবাবু নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইলেন। এবার আর কিছু না ভেবে আমি দৌড় লাগালাম কাকাবাবুর দিকে। সব সময় তো আর সাবধান হওয়ার কথা মনে থাকে না! দৌড়েই বুঝতে পারলাম, কী

দারুণ ভুল করেছি! পাহাড়ের ঢালু দিকে দৌড়োতে গিয়ে আমি আর থামতে পারছি না। আমার গতি ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে!

কাকাবাবুর কাছাকাছি গিয়ে আমি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম। ওঁর হাত ধরে চেঁচিয়ে উঠলাম, কাকাবাবু!

কাকাবাবু মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বললেন, বললাম না, পাহাড়ের নিচের দিকে দৌড়োতে নেই! আর কক্ষনো এ রকম করবে না!

সেকথা অগ্রাহ্য করে আমি বললাম, কাকাবাবু, তোমার লাগেনি তো?

—তোমার লেগেছে কি না বলো!

—না, আমার কিছু হয়নি। তুমি...তুমি এতটা গড়িয়ে পড়লে...

—ও কিছু না। ওতে কিছু হয় না।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে কাকাবাবুকে টেনে তুলতে গেলাম। কাকাবাবু আমার হাত ছাড়িয়ে নিজেই উঠে দাঁড়ালেন। কাকাবাবুর একটা পা ভাঙা, কিন্তু মনের জোর অসাধারণ। এমন ভাব করলেন, যেন কিছুই হয়নি।

কিন্তু চোখে হাত দিয়েই কাকাবাবু বললেন, এই যা! আমার চশমা?

চশমা ছাড়া কাকাবাবু চোখে প্রায় কিছুই দেখতে পান না। খুব কাছ থেকেও মানুষ চিনতে পারেন না। গড়িয়ে পড়ার সময় কাকাবাবুর চশমাটা কোথায় হারিয়ে গেছে। কাছাকাছি কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না।

হারিয়ে গেলে যদি অসুবিধেয় পড়তে হয়, সেই জন্য কাকাবাবুর এক জোড়া চশমা থাকে। আর একটা আছে তাঁবুকে। আমি বললাম, যাক গে, কাকাবাবু, তোমার তো আর একটা চশমা আছে!

কাকাবাবু বললেন, কিন্তু এখন আমি এতটা রাস্তা ফিরবো কি করে? তা ছাড়া সেটাও যদি কোনোরকমে হারিয়ে যায়, তা হলে তো সব কাজই বন্ধ হয়ে যাবে! তুমি দাঁড়াও আমি চশমাটা খুঁজে দেখি!

সেই ঢালু পাহাড়ে এক পা উঠতে বা নামতেই ভয় করে—সেখানে চশমা খোঁজা যে কি শক্ত ব্যাপার, তা বলে বোঝানো যাবে না। কাকাবাবু আর আমি দু'জনে দু'জনকে ধরে রইলাম, তারপর খুঁজতে লাগলাম চশমা। প্রায় পনেরো মিনিট বাদে দেখা গেল, বরফের মধ্যে সেটা গেঁথে আছে, একটা ডাঁটি ভাঙা—আর কোনো ক্ষতি হয়নি।

হঠাৎ আমার কান্না পেয়ে গেল। কাকাবাবু যদি তখন সত্যি সত্যি পড়ে যেতেন, আমি একলা এখানে কী করতাম? কাকাবাবুকে ফেলে আমি ফিরেও যেতে পারতাম না, কিংবা একলা একলা...

আমি আবার বসে পড়ে বললাম, কাকাবাবু, আমার এই কাজ ভালো লাগে না!

কাকাবাবু বললেন, ভালো লাগে না? বাড়ির জন্য মন কেমন করছে?

আমি উত্তর না দিয়ে মুখ গোঁজ করে বসে রইলাম। সত্যি আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল, কিন্তু কাকাবাবুকে আমি তা দেখতে দিইনি।

কাকাবাবু বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, তোমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি। তুমি না হয় সিদ্ধার্থদের সঙ্গেই চলে যাও!

—আর তুমি কী করবে? তুমি এখানে একলা একলা থাকবে?

—হ্যাঁ। আমি থাকবো। আমি যে কাজটা আরম্ভ করেছি, সেটা শেষ না করে যাবো না।

সিদ্ধার্থদাদের সঙ্গে যাবার কথা শুনে আমার আনন্দ হয়েছিল। কিন্তু কাকাবাবুকে একলা ফেলে যেতেও ইচ্ছে করে না। কাকাবাবু একলা একলা পাহাড়ে ঘুরবেন—কাকাবাবু কি ভাবছেন, আমি নিজের কষ্টের কথা ভেবে চলে যেতে চাইছি? মোটেই তা নয়! কাকাবাবুর জন্যই তো আমার চিন্তা হচ্ছে।

আমি বললাম, কাকাবাবু, আমি তোমার সঙ্গেই থাকবো, তোমার সঙ্গে ফিরবো। কিন্তু ফিতে মাপার কাজ আমার ভালো লাগে না।

—ঠিক আছে, কাল থেকে অন্য একটা কমবয়সী ছেলেকে ঠিক করবো—সে ফিতে ধরবে, আর তুমি আমার পাশে থাকবে।

—কিন্তু কাকাবাবু, আমরা কী খুঁজছি? কী হবে এই রকম ফিতে মেপে?

কাকাবাবু একটুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, সন্তু, তুমি তো এখনও ছেলেমানুষ, এখন সব বুঝবে না। বড় হলে বুঝবে, আমরা যা খুঁজছি, যদি পাই, সেটা কত বড় আবিষ্কার!

—তাহলে আরও লোকজন নিয়ে এসে ভালো করে খুঁজলে হয় না?

—আমি বিশেষ কারুকে বলতে চাই না। কারণ যা খুঁজছি, তা যদি শেষ পর্যন্ত না পাই, লোকে শুনে হাসাহাসি করবে। পাবোই

যে তারও কোনো মানে নেই। সুতরাং চুপচাপ খোঁজাই ভালো, যদি হঠাৎ পেয়ে যাই, তখন সবাই অবাক হবে। তখন তোমাকেই সবাই বলবে বাহাদুর ছেলে!

—কাকাবাবু, আমরা আসলে কী খুঁজছি? সোনা?

কাকাবাবু চমকে উঠে বললেন, কী বললে, সোনা? না, না, সোনা-টোনা কিছু নয়। পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে কেউ সোনা পায় নাকি? যত সব বাজে কথা!

—তাহলে?

—আমরা খুঁজছি একটা চৌকো পাতকুয়ো। চৌবাচ্চাও বলতে পারো। কিন্তু সাধারণ চৌবাচ্চার থেকে অনেক গভীর। চলো, আজকের মতন ফেরা যাক।

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাস্তায়

সেদিন সন্ধেবেলা পহলগ্রামে আমাদের তাঁবুতে ফিরে এসে টের পেলাম, আমার বাঁ পায়ে বেশ ব্যথা হয়েছে। কখন একটু মচকে গেছে টের পাইনি। আয়োডেক্স মালিশ করলাম বেশ করে। কাকাবাবু যদিও বললেন, তাঁর কিছু হয়নি, তবুও আমি ওঁর দু' পায়ে মলম মালিশ করে দিলাম।

বলতে ভুলে গেছি, এখানে সন্ধে হয় নটার সময়। সাড়ে আটটা পর্যন্ত বিকেলের আলো থাকে। প্রথম প্রথম ভারী অদ্ভুত লাগতো। আমাদের রাত্তিরের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলেও বাইরে তখন বিকেল। সূর্য অস্ত যাবার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত দিনের আলো। আমাদের দেশেই কত জায়গায় কত যে আশ্চর্য সব ব্যাপার আছে। বই পড়ে এই পৃথিবীটাকে কিছুই চেনা যায় না।

সিদ্ধার্থদারা বলেছিলেন, ওঁরা আজকের রাতটা প্লাজা হোটেলে থাকবেন। ভেবেছিলাম ফিরে এসে ওঁদের সঙ্গে দেখা করে আসবো। কিন্তু পায়ের ব্যথার জন্য যাওয়া হলো না। হোটেলটা বেশ খানিকটা দূরে। বিছানায় শুয়ে লীদার নদীর শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভোরবেলা উঠে কাকাবাবুকে কিছু না বলেই আমি বেরিয়ে পড়লাম একলা-একলা। আজ কাকাবাবুর থেকেও আমি আগে উঠেছি। লীদার নদী পহলগ্রামে যেখানটায় ঢুকেছে, সেখানে একটা

ছোট্ট কাঠের ব্রিজ। আমি ব্রিজটার ওপর দাঁড়িয়ে রইলাম। সিদ্ধার্থ-দারা অমরনাথে যাবেন, এই রাস্তা দিয়েই যেতে হবে।

একটু পরেই দেখা গেল ওঁদের। সঙ্গে আরও কয়েকজন লোক আছেন আর দুজন গাইড। সবাই ঘোড়ার পিঠে। স্নিগ্ধাদি আর রিণিকে তো চেনাই যায় না। ব্রীচেস, ওভারকোট, মাথায় টুপি, হাতে দস্তানা, চোখে কালো চশমা। সিদ্ধার্থদাকেও বেশ মানিয়েছে, তবে সিদ্ধার্থদার ঘোড়াটা ওঁর তুলনায় বেশ ছোট।

স্নিগ্ধাদি আমাকে দেখেই বললেন, ওমা, তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস? আমরা ভাবলুম বুঝি তোর সঙ্গে আর দেখাই হলো না। কাল সারাদিন কোথায় ছিলি?

—সোনমার্গে ছিলাম।

—ওখানে কী করলি? ওখানে তো দেখার কিছু নেই।

আমি চট্ করে একটু আকাশের দিকে তাকালাম। সত্যিই, আকাশটা রোজই নতুন হয়ে যায়।

সিদ্ধার্থদা বললেন, সন্তু, তুমিও আমাদের সঙ্গে গেলে পারতে!

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, আমাদের এখানে অনেক কাজ আছে।

সিদ্ধার্থদা হাসতে হাসতে জিগ্যেস করলেন, ছুটিতে পাহাড়ে বেড়াতে এসে আবার কাজ কী? এখানেও স্কুলের হোম-টাস্ক করছো নাকি?

উত্তর দিলাম না। ওঁদের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেলাম খানিকটা। রিণিকে বললাম, শোন, মুখে অনেকটা করে ক্রিম মেখে নে। না হলে কিন্তু ভীষণ চামড়া ফাটে!

রিণি খিলখিল করে হেসে বললো, দিদি, দেখছো, সন্তু কী রকম বড়দের মতন কথা বলতে শিখেছে!

—আহা, আমি তোদের থেকে বেশীদিন আছি না! আমি তো এসব জানবোই!

—তুই সত্যি আমাদের সঙ্গে গেলে পারতিস। তুই বেশ গাইড হতিস আমাদের! জানিস, আমি অনেকগুলো ছবি এঁকেছি। তোকে দেখানো হলো না।

আমার তো ইচ্ছে হচ্ছিল তক্ষুনি ওদের সঙ্গে চলে যাই। যে-পোশাক পরে আছি সেইভাবেই। কিন্তু তা হয় না। আমি একটু অবজ্ঞার সঙ্গে বললাম, অমরনাথে এমন কিছু দেখবার নেই। ওসব

মন্দির-টন্দির দেখতে আমার ভালো লাগে না। তাছাড়া আমি তো চন্দনবাড়ি আর কোহলাই পর্যন্ত গিয়েছি একবার!

স্নিগ্ধাদি বললেন, হ্যাঁরে, আমরা ফিরে আসা পর্যন্ত থাকবি তো? আমাদের তো যাওয়া-আসা নিয়ে বড়জোর সাতদিন! কিংবা রাস্তা খারাপ থাকলে তার আগেও ফিরে আসতে পারি!

আমি জোর দিয়ে বললাম, হ্যাঁ, থাকবো। থাকবো।

রিণি ঘোড়ার ওপর একটু ভীতু ভীতু ভাবে বসে ছিল। আমি ওকে বললাম, এই, ঠিক করে শক্ত হয়ে বোস্! প্রথম দিন একটু গায়ে ব্যথা হবে, তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে!

রিণি বললো, যা, যা, তোকে আর শেখাতে হবে না! এলি না তো আমাদের সঙ্গে।

আমি বললাম, তোরা অমরনাথ থেকে ফিরে আয়—তখন অন্য কোথাও আমরা সবাই মিলে এক সঙ্গে বেড়াতে যাবো।

তারপর ওরা এগিয়ে গেল, আমি দাঁড়িয়ে থেকে ওদের দিকে হাত নাড়তে লাগলাম।

ক্যাম্পে ফিরেই আবার সব কিছু অন্যরকম হয়ে গেল। কাকাবাবু ততক্ষণে উঠে পড়েছেন। আমি বাইরে বেরিয়েছিলুম বলে কিছু জিগেস করলেন না। একমনে ম্যাপ দেখছিলেন। এক সময় মুখ তুলে বললেন, সন্তু, আমি ঠিক করলাম, পহলগামে আমাদের আর থাকা হবে না। এখান থেকে যাতায়াত করতে অনেক সময় যায়। সোনমার্গ থেকে কাল পাহাড়ের নিচে যে ছোট্ট গ্রামটা দেখলাম, ওখানে গিয়েই দিন দশেক থাকা যাক্!

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। পহলগাম থেকেও চলে যেতে হবে? সিদ্ধার্থদা, রিণি, স্নিগ্ধাদিদের সঙ্গে আর দেখা হবে না?

আমি মুখ শুকনো করে জিগেস করলাম, ঐ গ্রামে থাকবো? ওখানে থাকার জায়গা আছে?

কাকাবাবু আমার মুখের দিকে না তাকিয়েই বললেন, সে ঠিক ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কালকে ঘোড়াওয়ালা ছেলে দুটোর সঙ্গে কথা বলেছি। ওরাও ঐ গ্রামে থাকে। এটাই বেশ ভালো হবে। চেনাশুনো কারুর সঙ্গে দেখা হবে না—নিরিবিলিতে কাজ করা যাবে।

চেনাশুনো লোকের সঙ্গে দেখা হলে সবাই খুশী হয়। কাকাবাবুর সব কিছুই অন্যরকম। ঐ ছোট্ট গ্রামে থাকতে আমার একটুও ইচ্ছে করছে না। তবু পহলগামে কত লোকজনের সঙ্গে দেখা হয়।

এখন এ জায়গা ছেড়ে আবার কোন্ ধাদ্দাড়া গোবিন্দপুরে যেতে হবে! কিন্তু কাকাবাবু একবার যখন ঠিক করেছেন, তখন যাবেনই!

কাকাবাবু বললেন, জিনিসপত্তর সব গুছিয়ে নাও। বেশী দেরি করে আর লাভ কী?

বাস-স্টপের কাছে আজও সুচা সিং-এর সঙ্গে দেখা হলো। বিশাল একখানা হাত আমার কাঁধের ওপর রেখে বললেন, কী খোকাবাবু, কাল সোনমার্গ কী রকম বেড়ানো হলো?

তারপর হা-হা করে হেসে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, কী প্রোফেসারসাব, কাল যে বললেন সোনমার্গ যাবেন না? আমি তো কাল দেখলাম, আপনারা সোনমার্গ থেকে ফিরছেন বিকেলে!

কাকাবাবু নীরসভাবে বললেন, আমরা কবে কোথায় যাই কোনো ঠিক তো নেই।

—তা এই গরিব মানুষের গাড়িতে যেতে আপনার এত আপত্তি কেন? আমি তো ঐদিকেই যাই!

—তোমাকে শুধু শুধু কষ্ট দিতে চাই না।

—এতে তকলিফ কী আছে? আপনি এত বড় পড়ালিখা জানা আদমি, আপনার যদি একটু সেবা করতে পারি—আপনি আজ কোন-দিকে যাবেন?

—আজও সোনমার্গই যাবো!

সুচা সিং একটু অবাক হয়ে গেলেন। ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, আবার সোনমার্গ? ওখানে কিছু পেলেন? জায়গাটা তো একদম ন্যাড়া। কিছু নেই!

কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, সিংজী, তুমি মিথ্যেই ভাবনা করছো! আমি সোনা খুঁজছি না। সে সাধ্যও আমার নেই!

সুচা সিং গলার আওয়াজ নিচু করে বললেন, আপনি মার্টন-এর পুরোনো মন্দিরে গেছেন? সবাই যে সূর্য দেবতার মন্দিরে যায় সেখানে নয়—পাহাড়ের ওপরে যে পুরোনো মন্দির? লোকে বলে ঐ মন্দির ললিতাদিত্যের আমলের চেয়েও পুরোনো। সিকন্দর বুত শিকন ঐ মন্দির ভেঙে দেয়। কেন অত কষ্ট করে ঐ বিরাট মন্দির ভেঙে দিল জানেন? ঐ মন্দিরের কোনো যায়গায় মণ মণ সোনা পোঁতা আছে। সিকন্দর বুত শিকন তা খুঁজে পায়নি। সেই সোনা এখনও আছে।

কাকাবাবু বললেন, তাহলে সে কথা আমাকে বলে দিচ্ছো কেন?

সোনার কথা কি সবাইকে বলতে আছে? নিজেই খুঁজে দেখো না!

সুচা সিং কাকাবাবুকে একটু তোষামোদ করার সুর করে বললেন, আপনারা পণ্ডিত লোক, আপনারা জানেন রাজারা কোথায় কোন্ জায়গায় গুপ্ত সম্পদ লুকিয়ে রাখতেন। সাধারণ লোকেরা কি ওসব জানতে পারে?

—তাই যদি হতো সিংজী, তাহলে পণ্ডিতরা এত গরিব হয় কেন? পণ্ডিতরা সোনার খবর কিছুই বোঝে না! আচ্ছা চলি!

সুচা সিং বাধা দিয়ে বললেন, দাঁড়ান, দাঁড়ান, অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন! কমসে কম এক পেয়ালা চা তো খান আমার সঙ্গে?

কাকাবাবু বললেন, আমি সকালে দু কাপের বেশী চা খাই না। সেই দু' কাপ আজ খাওয়া হয়ে গেছে।

—তা হলে খোকাবাবুকে কিছু খাইয়ে দিই! খোকাবাবু জিলাবি খেতে খুব ভালোবাসে!

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, আমি কিছু খাবো না। আমার পেট ভর্তি!

তবু সুচা সিং আজ আর কিছুতেই ছাড়লেন না। অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে এড়ানো গেল না। আজ জোর করে আমাদের তুললেন নিজের গাড়িতে। একটা বেশ মজবুত জিপ গাড়ি, সুচা সিং সেই গাড়িতেই ওদিকেই কোথায় যেন যাচ্ছেন কোনো একজন সরকারী হোমরা-চোমরার সঙ্গে দেখা করতে।

যাওয়ার পথে সুচা সিং অনেক গল্প করতে লাগলেন। আমি অবশ্য সব বুঝতে পারলাম না। আমি তাকিয়ে রইলাম বাইরের দিকে। কী সুন্দর ছবির মতন রাস্তা। পাহাড় চিরে এঁকেবেঁকে উঠেছে। দু' পাশে পাইন আর পপলারের বন। মাঝে মাঝে চেনার গাছও দেখা যায়। চেনার গাছগুলো কী বড় বড় হয়, অনেকটা আমাদের দেবদারু গাছের মতন—যদিও পাতাগুলো অন্যরকম। হঠাৎ হঠাৎ চোখে পড়ে যায় আখরোট, খোবানি আর নাশপাতির গাছ। এগুলো অবশ্য আমার চোখে এখন নতুন লাগে না। আমি গাছ থেকে বুনো আপেল আর আঙুরও ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছি। কলকাতায় বসে এ কথা স্বপ্নেও ভাবা যায়? কত যে গোলাপফুল রাস্তায় ঘাটে ফুটে আছে!

কাকাবাবু জিগ্যেস করলেন, সিংজী, তুমি এই কাশ্মীরে কতদিন আছো?

সুচা সিং বললেন যে কাশ্মীরে যখন যুদ্ধ হয় সাতচল্লিশ সালে,

তখন তিনি এখানে এসেছিলেন লড়াই করতে। তখন সৈনিক ছিলেন। যুদ্ধে তাঁর একটা আঙুল কাটা যায়।

সুচা সিং তাঁর বাঁ হাতটা দেখালেন, সত্যিই তাঁর কড়ে আঙুলটা নেই।

সুচা সিং হাসতে হাসতে বললেন, আমি সবাইকে কী বলি জানেন? এই কড়ে আঙুলের খোঁচা দিয়েই আমি হানাদারদের তাড়িয়ে দিয়েছি।

—তারপর, তুমি এখানেই থেকে গেলে?

—না। যুদ্ধ থামলে ফিরে গিয়েছিলাম। কিন্তু কাশ্মীর আমার এমন পসন্দ হয়ে গেল, সেনাবাহিনীর কাজ ছেড়ে দিয়ে আমি এখানেই চলে এলাম ব্যবসা করতে। এখন আমি এখানকারই লোক। কাশ্মীরী মেয়েকেই শাদী করেছি। দু শো টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিলাম, এখন দেখুন না, আমার নয়খানা গাড়ি খাটছে! কাশ্মীরের মাটিতে সোনা আছে, বুঝলেন! নইলে ইতিহাসে দেখুন না, সবারই লোভ ছিল কাশ্মীরের দিকে!

কাকাবাবু তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, তুমি লেগে থাকো। তুমি হয়তো একদিন এই সোনার খোঁজ পেয়েও যেতে পারো সিংজী।

সোনমার্গ পৌঁছে সুচা সিং তাঁর চেনা একজন লোককে ডেকে বললেন, এই প্রোফেসার খুব বড়া আদমি। সব সময় এর দেখাশোনা করবে!

তারপর সুচা সিং চলে গেলেন। কাকাবাবু অবশ্য সুচা সিং-এর চেনা লোকটিকে পাত্তাই দিলেন না। তার হাত এড়িয়ে সোজা চলে এলেন ঘোড়াওয়ালাদের জটলার দিকে। গত কালের সেই দুটো ছেলে-কেই ঠিক করলেন আজ। কোনো রকম দরাদরি না করেই ঘোড়ায় চড়ে বসে বললেন, চলো!

একটু দূরে গিয়েই কাকাবাবু থামলেন। ঘোড়াওয়ালা ছেলে দুটিকে ডেকে জিগ্যেস করলেন, এই তোমাদের নাম কী?

নাম জিগ্যেস করতেই ওদের কী লজ্জা। মেয়েদের মতন ওদের ফর্সা গাল লাল হয়ে গেল। কিছুতেই বলতে চায় না। কেউ বুঝি কখনো ওদের নাম জিগ্যেস করেনি। একজনে আর একজনের মুখের দিকে তাকিয়ে ফিক ফিক করে হাসছে। তাই দেখে আমি আর কাকাবাবুও হাসতে লাগলাম। অনেক কষ্টে জানা গেল, একজনের নাম আবুতালেব। আর একজনের নাম তো বোঝাই যায় না। শুনে
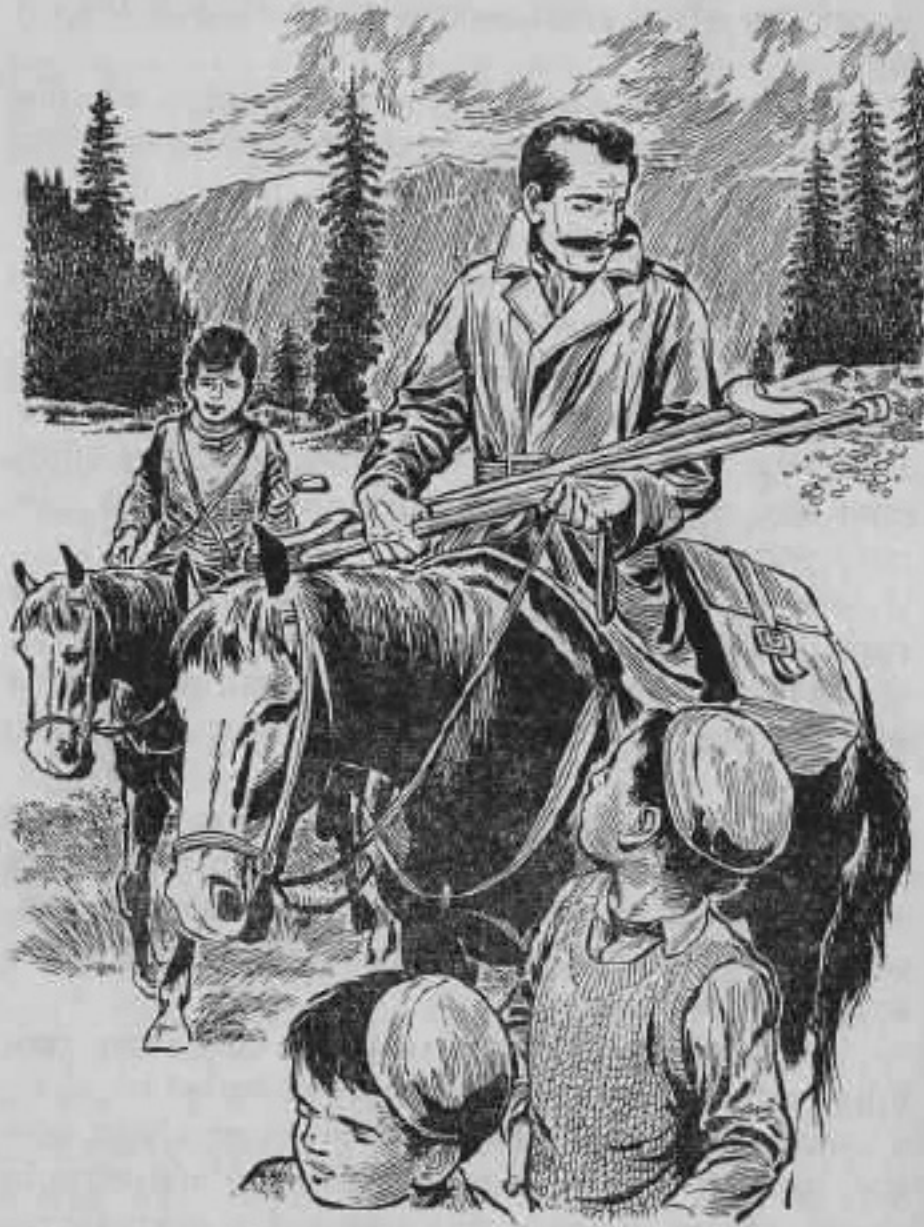
ঘোড়াওয়ালা ছেলেদুটিকে ডেকে জিগ্যেস করলেন, এই তোমাদের নাম কী?

মনে হলো, ওর নাম হুন্দা। কী? আর কিছু নেই? শুধু হুন্দা? তা সে জানে না। নামটা যেন খুবই একটা অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার।

কাকাবাবু আমার দিকে চেয়ে বললেন, এরা হচ্ছে খশ্ জাতি। এদিককার পাহাড়ে এদের দেখা যায়।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। এখানে না এলে কি জানতে পারতাম, খশ্ জাতি নামেও একটা জাতি আছে আমাদের দেশে! যে-জাতের একটা ছেলে নিজের নামটাও ভালো করে জানে না। হুন্দার মতন একটা বিদঘুটে নাম কে ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে, তাই নিয়েই ও খুব খুশী। অথচ কী সুন্দর দেখতে ছেলেটাকে। আর বেশ চটপটে, বুদ্ধিমান।

কাকাবাবু জিগ্যেস করলেন, তোমাদের গ্রামে থাকার জায়গা পাওয়া যাবে? আমাদের থাকতে দেবে?

ছেলে দুটি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। এ রকম প্রশ্ন ওরা কখনো শোনেনি। ওদের গ্রামে বোধহয় কোনো বাইরের লোক থাকেনি কখনো।

কাকাবাবু পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে বললেন, যদি থাকতে দাও তাহলে রোজ দশ টাকা করে ভাড়া দেবো। তাছাড়া খাবার খরচ আলাদা। যে-কোনো রকমের একটা ঘর হলেই আমাদের চলবে।

টাকাটা দেখেই ওদের মুখে হাসি ফুটলো। পরস্পর কী যেন আলোচনা করে নিয়েই ওরা রাজী হয়ে গেল। তা বলে, ওদের কিন্তু লোভী মনে করা উচিত নয়। ওরা বড্ড গরিব তো, টাকার খুব দরকার ওদের।

গলাণ্ডীর নামে একটা জায়গা আছে, সেইদিকে ওদের গ্রাম। আমরা উঠতে লাগলাম পাহাড়ী পথে। পাশ দিয়ে রুপোর পাতের মতন একটা নদী বয়ে যাচ্ছে। কাকাবাবু বললেন, ওর নাম কণ্ডানা নদী। সন্তু ঐ যে রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছো, ঐ রাস্তাটা চলে গেছে লন্দাকে। এমনিতে লোক যাকে বলে লাডাক। এই রাস্তাটা খুব ভয়ংকর। এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে কত মানুষ যে প্রাণ হারিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই!

আস্তে আস্তে ঘোড়া চলছে, আমি চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। কী সুন্দর জায়গাটা! এখানে এলে মরার কথা মনেই হয় না। পাহাড়ের পর পাহাড়ের সারি। দূরে একটা পাহাড়ের মাথা সব

পাহাড়কে ছাড়িয়ে জেগে রয়েছে। সেটা দেখতে ঠিক মন্দিরের মতন।

—কাকাবাবু, মন্দিরের মতন ঐ পাহাড়টার নাম কী?

—ঠিকই বলেছিস, মন্দিরের মতন! সাহেবরাও ঐ পাহাড়ের নাম দিয়েছে ক্যাথিড্রাল পীক। সব পাহাড় ছাড়িয়ে উঠেছে ওর মাথা। দেখলেই মনে হয় না, এক সময় দেবতারা থাকতো এখানে? ঐ যে রাস্তাটার কথা বললাম, ওটাকে ওয়াংশাথ নালাও বলে। ঐ রাস্তা শুধু লদাকে নয়, ওটা দিয়ে সমরখন্দ, পামীর, বোখারা, তাসখন্দ যাওয়া যায়। হাজার হাজার বছর আগে থেকেও মানুষ ঐ রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেছে। ঐ রাস্তাটার জন্যই আমার এখানে আসা।

আমি জিগ্যেস করলাম, কাকাবাবু, এই রাস্তা দিয়েই কি আর্যরা ভারতে এসেছিল?

কাকাবাবু বললেন, তা ঠিক বলা যায় না। আর্যদের বোধহয় রাস্তা কিছু কিছু বানিয়ে নিতে হয়েছিল। ইন্দ্র কাশ্মীরে পাহাড় ফাটিয়ে বন্ধ জলাশয়ের মুক্তি দিয়েছিলেন—এ রকম একটা কাহিনীও আছে।

যেতে যেতে একটা মিলিটারি ক্যাম্প পড়লো। বন্দুকধারী মিলিটারি এসে আমাদের আটকালো। কাকাবাবু ঘোড়া থেকে নেমে তার সঙ্গে কী যেন কথা বললেন। দেখালেন কাগজপত্র। যে কোনো জায়গায় ঘোরাফেরা করার অনুমতিপত্র কাকাবাবুর আছে। কাকাবাবুর কাছে একটা রিভলবার থাকে। সেটা আর তার লাইসেন্সও দেখালেন বার করে।

মিলিটারির লোকেরা আমাদের চা না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়বে না। প্রায় জোর করে নিয়ে গেল ওদের তাঁবুতে। আমাদের দেখে ওরা হঠাৎ যেন খুব খুশী হয়ে উঠেছে। কাকাবাবু বললেন, ওরা তো কথা বলার লোক পায় না। মাসের পর মাস এখানে এমনি পড়ে আছে, আমাদের দেশকে পাহারা দিচ্ছে। তাই কথা বলার লোক পেলে ওদের ভালো লাগে।

সেখানে দুধে সেদ্ধ করা চা আর হালুয়া খেলাম। গল্প করলাম কিছুক্ষণ। আমাকে একজন মিলিটারি বললো, খোকাবাবু, হরিণের শিং নেবে? এই নাও!

বেশ একটা হরিণের শিং উপহার পেয়ে গেলাম। মিলিটারি দুজনেই পাঞ্জাবী শিখ। ভারী ভালো লোক। ঠিক আত্মীয়-স্বজনের মতন ব্যবহার করছিল আমাদের সঙ্গে। আমরা একটা পাহাড়ী গ্রামে

থাকবো শুনে ওরা তো অবাক। কত রকম অসুবিধের কথা বললো। কাকাবাবু সে সব হেসে উড়িয়ে দিলেন। ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার উঠতে লাগলাম পাহাড়ী রাস্তায়। কাকাবাবু বললেন, আমরা সাড়ে সাত হাজার ফিটেরও বেশী উঁচুতে এসেছি।

আবু তালেব আর হুন্দাদের গ্রাম পাশাপাশি। কোন গ্রামে থাকবো, তাই নিয়ে ওরা দুজনে আমাদের টানাটানি করতে আরম্ভ করলো। কেউ ছাড়বে না। শেষ পর্যন্ত সব দেখেশুনে কাকাবাবু ঠিক করলেন, আবু তালেবদের গ্রামটাতেই থাকবেন। তবে, হুন্দা আমাদের জন্য রান্নাটান্না ও অন্যান্য ব্যাপার দেখাশুনোর কাজ নেবে—এ জন্য সে-ও রোজ দশ টাকা করে পাবে।

ওদের গ্রামে পৌঁছুনো-মাত্র গ্রামের সব লোক ভিড় করে এসে আমাদের ঘিরে ধরলো। সবারই চোখে মুখে দারুণ কৌতূহল। ওদের গ্রামের বাচ্চারা কিংবা মেয়েরা আমাদের মতন জামাকাপড়-পরা মানুষই কখনো দেখেনি।

আবু তালেব নিজস্ব ভাষায় ওদের কী সব বোঝালো। ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করলো খানিকক্ষণ। তারপর আমাদের একটা ঘরে নিয়ে গেল। একখানা ছোট কাঠের ঘর, বোধহয় অন্য কেউ থাকতো, আমাদের জন্য এইমাত্র খালি করা হয়েছে। কাকাবাবু একবার দেখেই ঘরটা পছন্দ করে ফেলেছেন।

গ্রামখানা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ছোট ছোট কাঠের বাড়ি। পাহাড়ের গায়ে বাড়িগুলো যেন সাজিয়ে সাজিয়ে বসানো হয়েছে। পাহাড়ের নিচের দিকে খুব ঘন জঙ্গল। শুনলাম, এই গ্রামে একটাই শুধু অসুবিধে, খুব জলের কষ্ট। পাহাড়ের একেবারে নিচ থেকে জল আনতে হয়। হোক, এই শীতে বেশী জল তো লাগবে না আমাদের!

আমাদের ঘরখানার পেছনেই খানিকটা সমতল জায়গা। তার পর খাদ নেমে গেছে। খাদের ওপারে আর একটা পাহাড়, সেই পাহাড়টা ভর্তি জঙ্গল। জানলা দিয়ে তাকালে মনে হয়, ঠিক যেন বিরাট একটা পাহাড়ের ছবি আকাশের গায়ে ঝোলানো। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

কাকাবাবু বললেন, সন্তু, ঘরটা ভালো করে গুছিয়ে ফ্যাল। জায়গাটা বেশ নিরিবিলি, আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তুই এখানে থাকতে পারবি তো?

আমি ঘাড় কাৎ করে বললাম, হ্যাঁ। কতদিন থাকবো এখানে?

—দিন দশ-বারো। এর মধ্যে যদি কিছু না হয়, তাহলে এবারকার মতন ফিরে যেতে হবে। তোরও তো ইস্কুলের ছুটি ফুরিয়ে আসবে।

—আমার ইস্কুল খুলতে এখনও কুড়ি দিন বাকি।

—ঠিক আছে। এবার ভালো করে কাজ শুরু করতে হবে।

আমার শুধু একবার মনে হলো, সিদ্ধার্থদা, স্নিগ্ধাদি, রিণিরা জানতেও পারবে না, আমরা কোথায় আছি। ওদের সঙ্গে আর দেখা হবে না।

দুই চোখে আগুন, এক অশ্বারোহী

এখানে আমাদের চার দিন কেটে গেল। সারাদিন কাকাবাবু আর আমি ঘুরে বেড়াই, ফিতে নিয়ে মাপামাপি হয়। জঙ্গলের ভেতরেও চলে যাই। কাজ অবশ্য কিছুই হচ্ছে না, তবে বেড়ানো তো হচ্ছে। কাশ্মীরে অনেকেই বেড়াতে যায়, কিন্তু কেউ তো গুজর আর খশ্ জাতির লোকদের সঙ্গে তাদের গ্রামে থাকেনি।

এই জায়গার লোকেরা যে কি ভালো তা কি বলবো! আমাদের সঙ্গে ওরা অসম্ভব ভালো ব্যবহার করে। ওরা অনেকেই আমাদের ভাষা বোঝে না, আমিও ওদের ভাষা বুঝি না, তবু কোনো অসুবিধে হয় না। হাত পা নেড়ে ঠিক বুঝিয়ে দেওয়া যায়। একদিন আমার কোটের একটা বোতাম ছিঁড়ে গিয়েছিল, সেটা শেলাই করার জন্য আমি সূঁচ-সুতো চেয়েছিলাম। কিছুতেই আর সেটা ওরা বুঝতে পারে না। একবার নিয়ে এলো একটা গামলা, একবার নিয়ে এলো বঁটি। শেষ পর্যন্ত যখন বুঝতে পারলো, তখন কোটটা ছোঁ মেরে নিয়ে গেল আমার কাছ থেকে। একটু বাদেই ওদের বাড়ি থেকে বোতাম শেলাই করে আনলো।

সন্ধেবেলাই বাড়ি ফিরে দরজা-জানলা সব বন্ধ করে থাকতে হয়। শীত এখানে বড্ড বেশী। খুব হাওয়া, সেইজন্য। ঘরের মধ্যে আমরা আগুন জেলে রাখি। খাওয়া-দাওয়া বেশ ভালোই হয়। গরম গরম মোটা মোটা চাপাটি আর মুরগী ঝোল। দুধ তো আছেই, তাছাড়া গ্রামের একটি মেয়েও দিনের বেলা আমাদের রান্না-টান্না করে দেয়। কাশ্মীরের লোকেরা ভালো রান্না করে, তবে নুন

দেয় বড্ড বেশী। বলে-বলেও কমানো যায় না। এরা সবাই এত বেশী নুন খায় যে আমাদের কম নুন খাওয়ার কথা বিশ্বাসই করতে পারে না। এরা ঝালও বেশী খায়, তবে সেটা এতদিনে আমার অভ্যেস হয়ে গেছে।

সারাদিনটা আমার বেশ ভালোই কাটে। সন্ধের সময়ও মন্দ লাগে না, তখন গ্রামের দু' চারজন বুড়ো লোক আসে, আগুনের ধারে বসে গল্প হয়।

কিন্তু রাত্তিরটা আমার কাটতেই চায় না। ঘুম আসে না, খুব ভয় করে। চারদিক নিঝুম। মনে হয়, নিজের বাড়ি থেকে কোথায় কতদূরে পড়ে আছি। বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল বাবা-মার কাছ থেকে কোনো চিঠি পাইনি। আমারও লেখা হয়নি। পহলগাম থেকে লিখতাম কিন্তু এখানে ধারেকাছে পোস্টাফিস নেই। বাড়ির জন্য মাঝে মাঝে মন কেমন করে। একটু একটু, বেশী না।

আমার কুকুরটার কথাও মনে পড়ে। এতদিন পর ফিরে গেলে ও কি আমায় চিনতে পারবে? মোটে তো দু' সপ্তাহ হলো এসেছি, অথচ মনে হয় যেন কতদিন কলকাতাকে দেখিনি। এইটাই বেশ মজার—বেড়াতে আসতেও খুব ভালো লাগে, আবার কয়েকদিন পরই কলকাতার জন্য মন ছটফট করে। রাত্তির বেলা ঘুম আসবার আগে যতক্ষণ একলা জেগে থাকি, তখনই কষ্ট হয় বেশী।

রাত্তিরে রোজ একটা শব্দ শুনতে পাই, সেটাই সবচেয়ে বেশী জ্বালায়। কী রকম অদ্ভুত শব্দ—অনেকটা ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের শব্দের মতন। কিন্তু শব্দটা মিলিয়ে যায় না। মনে হয় যেন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা ঘোড়া অনবরত দৌড়োবার ভান করছে। কিন্তু আমি ঘোড়াদের স্বভাব যেটুকু বুঝেছি, তারা তো ওরকম কক্ষনো করে না।

জানলা খুলেও দেখার উপায় নেই। মাঝরাত্তিরের ঠাণ্ডা হাওয়া লাগলে নির্ঘাৎ নিউমোনিয়া। তাছাড়া একলা একলা জানলা খুলতে আমার ভয় করে। এদিকে, ওর মধ্যে কাকাবাবু আবার ঘুমের ঘোরে কথা বলতে শুরু করেছেন। কার সঙ্গে যেন তর্ক করছেন কাকাবাবু। উঠে গিয়ে যে কাকাবাবুর গায়ে ধাক্কা দেবো, তা-ও ইচ্ছে করে না। বালিশে মুখ গুঁজে কান বন্ধ করে শুয়ে রইলাম। আমার কান্না পাচ্ছিল।

প্রথম রাত্তিরে কাকাবাবুকে আমি ডাকিনি, দ্বিতীয় রাত্তিরে

আর না ডেকে পারলাম না। কাকাবাবু ধড়মড় করে উঠে বসে বললেন, কী ? কী হয়েছে ?

আমি বিবর্ণ মুখে বললাম, একটা কী রকম বিচ্ছিরি শব্দ।

কাকাবাবু কান খাড়া করে শুনলেন। তারপর বললেন, কেউ ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে। এতে ভয় পাচ্ছো কেন ?

—আপনি শুনুন। অনেকক্ষণ ধরে, ঠিক একই জায়গায় ঐ এক রকম শব্দ।

কাকাবাবু আর একটু শুনলেন। হাল্কা ভাবে বললেন, ঘোড়ারই তো শব্দ, আর তো কিছু না! ঘুমিয়ে পড়ো—

—আমাদের জানলার খুব কাছে।

কাকাবাবুর সাহস আছে খুব। উঠে গলায় কমফর্টার জড়ালেন। আর একটা কমফর্টার দিয়ে কান ঢাকলেন—ওভারকোটের পকেট থেকে রিভলবারটা বার করলেন। তারপর দেখলেন জানলা খুলে। টর্চ জেলে তাকিয়ে রইলেন বাইরে। দু' এক মিনিট দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে। আবার জানলা বন্ধ করে এসে বললেন, ওটা কিছু নয়। নিশ্চিন্তে ঘুমো—

কাকাবাবু জানলা খুলে টর্চটা যখন জেলেছিলেন, তক্ষুনি শব্দটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। জানলা বন্ধ করতেই আবার শুরু হলো।

আমার গলা শুকিয়ে গেল। ফ্যাকাসে গলায় বললাম, কাকাবাবু, আবার শব্দ হচ্ছে!

—হোক না। শব্দ হলে ক্ষতি কী আছে ? যা চোখে দেখা যায় না, তার থেকে ভয়ের কিছু নেই।

—কিন্তু—

—আরে, এরকম পাহাড়ী জায়গায় অনেক কিছু শোনা যায়। রাত্তিরে সব আওয়াজই বেশী মনে হয়—তাছাড়া পাহাড়ের নানান খাঁজে হাওয়া লেগে কতরকম শব্দ হয়, কত রকম প্রতিধ্বনি—এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। ঘুমিয়ে পড়লে আর কিছুই শোনা যায় না।

আমি বললাম, কাকাবাবু, আমার যে কিছুতেই ঘুম আসছে না!

কাকাবাবু আমার খাটের কাছে এগিয়ে এলেন। তারপর বললেন, ঠিক আছে, তুই চোখ বুজে শুয়ে থাক্—আমি তোর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি—তাতেই ঘুম এসে যাবে।

কিন্তু একথা শুনে আমার লজ্জা করলো। আমি কি ছেলেমানুষ

নাকি যে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে হবে ? তা ছাড়া কাকাবাবু আমার জন্য জেগে বসে থাকবেন ! আমি বললাম, না, না, তার দরকার নেই। এবার আমি ঘুমোতে পারবো।

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, সেই ভালো। ভয়কে প্রশ্রয় দিতে নেই। এ তো শুধু একটা শব্দ, এসে ভয় পাবার কি আছে ?

আমি আবার কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে জিগ্যেস করলাম, ঠিক মনে হচ্ছে না ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ ? আমাদের জানলার খুব কাছে ?

কাকাবাবু আবার রিভলবারটা হাতে নিয়ে চেঁচিয়ে জিগ্যেস করলেন, কৌন হ্যায় ?

কোনো সাড়া নেই। তবে শব্দটা এবার আর থামলো না।

কাকাবাবু বললেন, এমনও হতে পারে—শব্দটা অনেক দূরে হচ্ছে। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে মনে হচ্ছে খুব কাছে। এত শীতে বাইরে বেরুনো উচিত নয়, না হলে বাইরে বেরিয়ে দেখা যেত। আচ্ছা দেখা যাক্, কাল কিছু ব্যবস্থা করা যায় কিনা !

পরদিন সন্ধেবেলা গ্রামের বৃদ্ধরা এলেন আমাদের সঙ্গে গল্প করতে। বড় বড় মগে চা ঢেলে খাওয়া হতে লাগলো। ঘরের এক কোনে আগুন জ্বলছে, মাঝে মাঝে আমি তার মধ্যে একটা দুটো কাঠ ছুঁড়ে দিচ্ছি। কাকাবাবু এ কথা সে কথার পর দুজন বৃদ্ধকে ঐ শব্দটার কথা জিগ্যেস করলেন।

একজন বৃদ্ধ শুনেই সঙ্গে সঙ্গে বললেন, বুঝেছি বাবুসাহেব, কাল তা হলে হাকো এসেছিল।

কাকাবাবু বললেন, হাকো কে ?

—কোনো কোনোদিন মাঝরাত্তিরে ঘোড়া ছুটিয়ে যায়। তবে ও কারুর ক্ষতি করে না।

—অত রাত্তিরে ঘোড়া ছুটিয়ে কোথায় যায় ?

বৃদ্ধ দুজন চুপ করে গেলেন। কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, তাছাড়া ঘোড়া ছুটিয়ে যায় না তো কোথাও! এক জায়গায় দাঁড়িয়েই তো ঘোড়া দাবড়ায় !

—ও ঐ রকমই।

কাকাবাবু আমার দিকে ফিরে ইংরাজিতে বললেন, নিশ্চয়ই এবার এরা একটা ভূতের গল্প শোনাবে। গ্রামের লোকেরা এইসব অনেক গল্প বানায়—তারপর শুনতে শুনতে ঠিক বিশ্বাস করে ফেলে।

কাকাবাবু বৃদ্ধদের আবার জিগ্যেস করলেন, আচ্ছা, হাকোকে দেখতে কী রকম ? কমবয়েসী ছোকরা, না, বয়স্ক লোক ? দিনের বেলা তার দেখা পাওয়া যায় না ?

বৃদ্ধ দু'জন চুপ করে গিয়ে পরস্পরের চোখের দিকে তাকালেন। তারপর ফস্ করে লম্বা লম্বা বিড়ি ধরিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে ধোঁয়া টানতে লাগলেন। যেন তাঁরা ও বিষয়ে আর কিছুই বলতে চান না।

কাকাবাবু তবু ছাড়বেন না। আবার জিগ্যেস করলেন, এই যে আপনারা হাকো না কার কথা বললেন, রাত্তির বেলা ঘোড়া ছুটিয়ে যায়—তাকে দেখতে কি রকম ?

একজন বৃদ্ধ বললেন, বাবু সাহেব, ও কথা থাক। হাকো আপনার ক্ষতি করবে না, শুধু শব্দই শুনবেন। আপনার ভয়ের কিছু নেই।

কাকাবাবু হেসে উঠে বললেন, শুধু শব্দ কেন, তার চেহারা দেখলেও আমি ভয় পাবো না। আমি তো তার কোনো ক্ষতি করি নি ! দিনের বেলা কেউ দেখেছে ?

—না, দিনের বেলা কেউ তাকে দেখেনি।

—আপনি তাকে কখনো দেখেছেন ? রাত্তিরে ?

বৃদ্ধটি চমকে উঠে বললেন, বাবুসাহেব, তাকে কেউ দেখতে চায় না। হাকো-কে দেখলে কেউ বাঁচে না। হাকো-র চোখ দিয়ে আগুন বেরোয়—তার চোখের দিকে চোখ পড়লেই মানুষ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তবে দিনের বেলা সে আসে না, ইচ্ছে করে কারুর কোনো ক্ষতি করে না—

কাকাবাবু বললেন, হুঁ ! চোখ দিয়ে আগুন বেরোয়। তাকে দেখতে কি মানুষের মতন না জন্তুর মতন ? কোনো গল্প-টল্প শোনেননি ? চোখের দিকে না তাকিয়ে পেছন দিক থেকে যদি কেউ দেখে ?

বৃদ্ধ বললেন, আমার ঠাকুর্দার মুখে শুনেছি, একবার একটি মেয়ে তার সামনে পড়ে গিয়েছিল। হাকো তখন হাত দিয়ে চোখ ঢাকা দেয়। মেয়েদের সে খুব সম্মান করে। সেই মেয়েটি দেখেছিল, হাকো খুব সুন্দর দেখতে একজন যুবাপুরুষ, তিরিশের বেশী বয়েস নয়—খুব লম্বা, মাথায় পাগড়ি, কোমরে তলোয়ার—

—তা সে বেচারা রোজ রাত্তিরে এখান দিয়ে ঘোড়া ছোটায় কেন ?

—এ তো শুধু আজকালের কথা নয় ! কত শো বছর ধরে যে হাকো এ রকম ভাবে যাচ্ছে, কেউ জানে না। হাকো ছিল একজন রাজার সৈন্য—লদ্দাকের রাস্তা দিয়ে সে রাজার খত নিয়ে যাচ্ছিল।

এক দুশমন তাকে একটা কুয়োর মধ্যে ধাক্কা দিয়ে মেরে ফেলে। সেই থেকে প্রায় রাত্তিরে...

কাকাবাবু চুরুট টানতে টানতে হাসিমুখে গল্প শুনছিলেন। হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন। ব্যস্তভাবে জিগ্যেস করলেন, কুয়োর মধ্যে ধাক্কা দিয়ে মেরে ফেলে ? এখানে কুয়ো কোথায় ? আমাকে দেখিয়ে দিতে পারেন ?

বৃদ্ধ বললেন, না, সে আমরা কখনো দেখিনি। শুনেছি এসব ঠাকুর্দা-দিদিমার কাছে—

আর একজন বৃদ্ধ বললেন, হ্যাঁ, আমিও শুনেছি ঐ সব জঙ্গল-টঙ্গলের দিকে বড় বড় কুয়ো আছে, একেবারে পাতাল পর্যন্ত চলে যায়—

কাকাবাবু বললেন, আমাকে নিয়ে যাবেন সেখানে ? অনেক বক-শিস দেবো।

প্রথম বৃদ্ধ বললেন, না, বাবুসাহেব, আমি কোনোদিন কুয়ো-টুয়োর কথা শুনিনি। এদিকে জলই পাওয়া যায় না, তা কুয়ো থাকবে কী করে ? পাহাড়ের গর্ত-টর্ত হয়তো আছে, তাই লোকে বলে—

আমি হাকো সম্পর্কে আরও গল্প শুনতে চাইছিলাম। কিন্তু কাকাবাবুর আর কোনো উৎসাহ নেই ওর সম্পর্কে। কাকাবাবু উত্তে-জিত হয়ে বারবার সেই কুয়োর কথা জিগ্যেস করতে লাগলেন। বৃদ্ধ দু'জনকে জেরা করতে লাগলেন, সারা গ্রামের কেউ কোনোদিন জঙ্গলের মধ্যে সেই কুয়ো দেখেছে কি না ! বৃদ্ধ দু'জন আর বিশেষ কিছুই বলতে পারলেন না। বকশিসের লোভ দেখিয়েও জানা গেল না কিছুই। মনে হলো, হাকো-র সম্পর্কে ওঁদের খুবই ভয় আছে—হাকোর ধারেকাছে যাবার ইচ্ছেও নেই ওঁদের।

সেদিন রাত্তিরবেলা কাকাবাবু টর্চ আর রিভলবার হাতে নিয়ে জানলার কাছে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। সেদিন কিন্তু কোনো শব্দই শোনা গেল না। কাকাবাবু হেসে বললেন, আজ আমাদের ভূতমশাই বোধহয় বিশ্রাম নিচ্ছেন। রোজ কি আর সারারাত ঘোড়া চালানো যায় ! তাছাড়া রিভলবার থাকলে ভূতও ভয় পায়।

পরের দিনও প্রথম রাত্তিরে কিছু শোনা যায়নি। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম সেই রহস্যময় ঘোড়-সওয়ারকে—যার দু চোখ দিয়ে আগুন বেরোয়, যার নাম হাকো—কী করে যে লোক তার নাম জানলো ! আমি হঠাৎ হাকোর সামনে পড়ে

গেছি...। হাকো আগুন-জ্বলা চোখে তাকিয়েছে আমার দিকে। আমি দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে...। ভয় পেয়ে আমার ঘুম ভেঙে গেল। তখন শুনলাম বাইরে সেই শব্দ হচ্ছে। কাকাবাবুকে ডেকে তুললাম। কাকাবাবু টর্চ জেলে দেখার অনেক চেষ্টা করলেন। কিছুই দেখা গেল না। আওয়াজ অনবরত চললো। যতক্ষণ জেগে রইলাম, সেই খট্ খট্ খট্ খট্ শব্দ। হাকো যদি ভূত হয়, তাহলে ঘোড়াটাও কি ভূত! ঘোড়ারা মরলে কি ভূত হয়? আমার ভীষণ খারাপ লাগতে লাগল। মনে হলো, আর একদিনও এখানে থাকা উচিত নয়। কিন্তু কাকাবাবু কিছুতেই যাবেন না। হাকোর গল্প শোনবার পরই কাকাবাবুর এই জায়গাটা সম্পর্কে আকর্ষণ আরও বেড়ে গেছে।

সকালবেলা উঠলে কিন্তু ঐ সব কথা আর তেমন মনে পড়ে না। কতরকম পাখির ডাক শোনা যায়। নরম রোদ্দুরে ঝকমক করে জেগে ওঠে একটা সুন্দর দিন। আবু তালেব আর হুন্দা দুটো ঘোড়া নিয়ে এসে হাজির হয়। মুখে সরল হাসি। তখন সব কিছুই ভালো লাগে।

আজকাল আর আমি ঘোড়া চালাবার সময় ওদের কারুকে সঙ্গে নিই না। নিজেই খুব ভালো শিখে গেছি। এক এক সময় খুব জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। খানিকটা নিচে নেমে গেলে বেশ ভালো রাস্তা—সেখানে আর কোনো রকম ভয় নেই।

কাকাবাবু বললেন, এদিকটা তো মোটামুটি দেখা হলো। চলো, আজ বনের ভেতরটা ঘুরে আসি।

আমি উৎসাহের সঙ্গে রাজী হয়ে গেলাম। বনের মধ্যে বেড়াতে আমার খুব পছন্দ হয়। এদিককার বনগুলো বেশ পরিষ্কার। ঝাউ আর চেনার গাছ—ভেতরটা অন্ধকার হলেও রাস্তা করে নেওয়া যায় সহজেই।

সেদিন বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতেই সেই সাঙ্ঘাতিক কাণ্ডটা হলো। তারপর থেকেই আমাদের সব কিছু বদলে গেল। জঙ্গলের বেশ খানিকটা ভেতরে এসে আমরা পায়ে হেঁটে ঘুরছিলাম। কাকাবাবু এখানেও ফিতে বার করে মাপতে শুরু করেছেন। এতদিনে আমার বদ্ধমূল বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে এক একজন লোকের যেমন এক এক রকম বাতিক থাকে—তেমনি এই ফিতে মাপার ব্যাপারটাও কাকাবাবুর বাতিক। নইলে, এই জঙ্গলে ফিতে দিয়ে জায়গা মাপার কোনো মানে হয়?

জঙ্গলের মাটি বেশ স্যাঁতসেঁতে। কাল রাত্তিরেও বরফ পড়েছিল,

এখন বরফ বিশেষ নেই, কিন্তু গাছগুলো থেকে চুঁইয়ে পড়ছে জল। হাঁটতে গেলে পা পিছলে যায়। ফিতেটা ধরে দৌড়োচ্ছিলাম, হঠাৎ আমি একটা লতা-পাতার ঝোপের কাছে পা পিছলে পড়ে গেলাম। বেশী লাগেনি, কিন্তু উঠতে গিয়েও পারলাম না উঠতে। জায়গাটা কী রকম নরম নরম। দূর থেকে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কি হলো, সন্তু, লেগেছে? আমি উত্তর দিলাম, না, না, লাগেনি। কিন্তু দাঁড়াতে পারছি না কিছুতেই। পায়ের তলায় শক্ত কিছু নেই। হঠাৎ আমি বুঝতে পারলাম, আমি নিচের দিকে নেমে যাচ্ছি। জায়গাটা আসলে ফাঁপা—ওপরটা ঝোপে ঢাকা ছিল।

চেঁচিয়ে ওঠবার আগেই লতা-পাতা ছিঁড়ে আমি পড়ে যেতে লাগলাম নিচে। কত নিচে কে জানে।

ভয়ের চোটে নিশ্চয়ই আমি কয়েক মুহূর্তের জন্য অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। কখন নিচে গিয়ে পড়লাম টের পাইনি। চোখ খুলে প্রথমেই মনে হলো, আমি কি মরে গেছি না বেঁচে আছি? আর কি কোনোদিন মাকে, বাবাকে দেখতে পাবো? মরে যাবার পর কি রকম লাগে তা-ও তো জানি না। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। একটা পচা পচা গন্ধ। হাতে চিমটি কেটে দেখলাম ব্যথা লাগলো। কিন্তু ওপর থেকে পরার সময় খুব বেশী লাগেনি—কারণ আমার পায়ের নিচেও বেশ ঝোপের মতন রয়েছে। আস্তে আস্তে অন্ধকারে চোখ সয়ে যাওয়ায় একটু একটু দেখতে পাচ্ছি। তাহলে নিশ্চয়ই মরিনি! আমি একটা বড় গর্ত বা শুকনো কোনো কুয়োর মধ্যে পড়ে গেছি। ভয়ের চেয়েও, বেঁচে যে গেছি—এই জন্য একটু আনন্দই হলো সেই মুহূর্তে। আরও গভীর গর্ত যদি হতো, কিংবা তলায় যদি শুধু পাথর থাকতো—তাহলে এতক্ষণে...। আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম, কাকাবাবু, কাকাবাবু—

কাকাবাবু অনেকটা দূরে আছেন। হয়তো শুনতে পাবেন না। নিচ থেকে কি আমার গলার আওয়াজ পৌঁছুচ্ছে? ওপর দিকটায় তাকিয়ে দেখলাম, প্রায় অন্ধকার। লতা-পাতা ছিঁড়ে যাওয়ায় সামান্য যা একটু ফাঁক হয়েছে, তাতেই সামান্য আলো।

তবে একটা খুব আশার কথা, ফিতের একটা দিক আমার হাতে তখনও ধরা আছে। অন্য দিকটা কাকাবাবুর হাতে। এইটা দেখে নিশ্চয়ই খুঁজে পাবেন।

শক্ত করে ফিতেটা এক হাতে চেপে রেখে আমি আর এক হাতে

চার পাশটায় কী আছে দেখার চেষ্টা করলাম। গর্তটা বেশ বড়। একটা কুয়োর মতন, কিন্তু জল নেই। এই কুয়োতেই কি হাকো-কে মেরে ফেলা হয়েছিল? এটা কি হাকো-র বাড়ি?

ভয়ে আমার সারা গা শিরশিরিয়ে উঠলো। আমি আবার চেঁচিয়ে উঠলাম, কাকাবাবু! কাকাবাবু!

চেঁচাতে চেঁচাতেই মনে হলো, কাকাবাবু এসেও কি আমাকে তুলতে পারবেন এখান থেকে? খোঁড়া পা নিয়ে কাকাবাবু একলা কী করবেন? কেন যে আবু তালেব আর হুন্দাকে আজ সঙ্গে আনিনি। কাকাবাবু এখান থেকে ওদের গ্রামে ফিরে গিয়ে ওদের ডেকে আনতে আনতেই যদি আমি মরে যাই? মনে হচ্ছে যেন এর মধ্যেই আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। পচা পচা গন্ধটা বেশী করে নাকে লাগছে। আর বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারবো না! আমি মরে গেলে আমার মায়ের কী হবে? মা-ও যে তাহলে কাঁদতে-কাঁদতে মরে যাবে!

গলা ফাটিয়ে আরও কয়েকবার আমি কাকাবাবুর নাম ধরে চেঁচালাম। এখনো আসছেন না কেন? হয়তো এখানকার কোনো শব্দ ওপরে পৌঁছোয় না।

একটু বাদে আমার হাতের ফিতেয় টান পড়লো। কাকাবাবুর গলা শুনতে পেলাম, সন্তু? সন্তু?

—এই যে আমি, নিচে—

ওপরে খ্যাচ-খ্যাচ শব্দ হতে লাগলো, আমার গায়ে গাছ লতা-পাতার টুকরো পড়ছে। কাকাবাবু ছুরি দিয়ে ওপরের জঙ্গল সাফ করছেন। খানিকটা পরিষ্কার হবার পর কাকাবাবু মুখ বাড়ালেন। ব্যাকুলভাবে বললেন, সন্তু, তোমার লাগেনি তো? সন্তু, কথা শুনতে পাচ্ছো?

—হ্যাঁ, পাচ্ছি। না, আমার লাগেনি।

—উঠে দাঁড়াতে পারবে?

—হ্যাঁ। আমি তো দাঁড়িয়েই আছি।

—তোমার আশেপাশে জায়গাটা কী রকম?

—কিছু দেখতে পাচ্ছি না। ভীষণ অন্ধকার এখানে।

—আমিও কিছু দেখতে পাচ্ছি না। দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও—

কাকাবাবু আবার ছুরি দিয়ে গাছপালা কেটে সাফ করতে লাগলেন। গর্তের মুখটা প্রায় সবই পরিষ্কার হয়ে যাবার পর কাকাবাবু বললেন, সন্তু, ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়াও। তোমার কোটের সামনের দিকটা পেতে ধরো, আমি আমার লাইটারটা ফেলে দিচ্ছি।

কোট পাততে হলো না, এখন আমি গর্তের ওপর দিকটা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। কাকাবাবু লাইটারটা ফেলে দিতেই আমি লুফে নিলাম।

—লাইটারটা জ্বালিয়ে দেখো, ওখানে কী আছে!

কাকাবাবু এই লাইটারে চুরুট ধরান। বেশ অনেকটা শিখা হয়। জ্বেলে চারপাশটা দেখলাম। গর্তটা বহু পুরোনো, দেয়ালের গায়ে বড় বড় গাছের শিকড়। দেখলে মনে হয় মানুষেরই কাটা গর্ত। একদিকে একটা সুড়ঙ্গের মতন। তার ভেতরটা এত অন্ধকার যে তাকাতেই আমার গা ছমছম করলো। বোঁটকা গন্ধটা সেদিক থেকেই আসছে মনে হলো।

সে-কথা কাকাবাবুকে বলতেই তিনি উত্তেজিতভাবে বললেন, ঠিক আছে। কোনো ভয় নেই। আমি একটা দড়ি গাছের সঙ্গে বেঁধে আর এক দিক নিচে নামিয়ে দিচ্ছি, তুমি শক্ত করে ধরবে!

তখন আমার মনে পড়লো, আমাদের ব্যাগের মধ্যে তো নাইলনের দড়ি আছে। ভীষণ শক্ত, কিছুতেই ছেঁড়ে না। তাহলে আর ভয় নেই। দড়ি ধরেই আমি ওপরে উঠে যেতে পারবো।

দড়িটা নিচে এসে পড়তেই আমি হাতের সঙ্গে পাক দিয়ে শক্ত করে ধরলাম। তারপর লাইটারটা নিভিয়ে দিয়ে বললাম, কাকাবাবু, আমি উঠছি ওপরে—

কাকাবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, না, না, উঠো না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি আসছি।

কাকাবাবুর তো খোঁড়া পা নিয়ে নিচে নামবার দরকার নেই। তাই আমি চেঁচিয়ে বললাম, না, না, তোমাকে আসতে হবে না। আমি নিজেই উঠতে পারবো।

কাকাবাবু হুকুম দিলেন, তুমি চুপ করে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি এক্ষুনি আসছি।

সেই দড়ি ধরে কাকাবাবু নেমে এলেন। মাটিতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই ফিসফিস করে বললেন, সন্তু, এই গর্তের মুখটা চৌকো—এই সেই চৌকো পাতকুয়ো! আমরা যা খুঁজছিলাম বোধহয় সেই জায়গা।

বিস্ময়ে আমার মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না। এই গর্তটা আমরা খুঁজছিলাম—এতদিন ধরে? কিন্তু কী আছে এখানে? এখানে কি

গুপ্তধন আছে ?

কাকাবাবু সুড়ঙ্গটার কাছে গিয়ে উঁকি মেরে বললেন, এর ভেতরে ঢুকতে হবে। সন্তু, তুমি ভিতরে ঢুকতে পারবে ?

কাকাবাবু এমন ভাবে কথা বলছেন যেন এই গর্তটা তাঁর বহুদিনের চেনা। আমরা যে বিপদে পড়েছি, কাকাবাবুর ব্যবহার দেখে তা-ও বোঝা যাচ্ছে না। বরং বেশ একটা খুশী খুশী ভাব। এখান থেকে বেরুবার চেষ্টা করার বদলে তিনি ঐ বিচ্ছিরি সুড়ঙ্গটার মধ্যে ঢুকতে চান !

আমি কাকাবাবুর গা ঘেঁষে ওভারকোটটা চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার ভীষণ ভয় করছে। আমি মরে গেলেও ঐ অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকতে পারবো না। কাকাবাবু একলা ঢুকলেও ভয়, কাকাবাবুর যদি কোনো বিপদ-টিপদ হয়ে যায় ! কাকাবাবু নিচে নামবার সময় ক্রাচ দুটো আনেননি। ওঁর এমনি দাঁড়িয়ে থাকতেই কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু উনি কিছু গ্রাহ্য করছেন না এখন।

কাকাবাবু বললেন, দাঁড়াও, আগে দেখিনি, সুড়ঙ্গটা কত বড়।

কাকাবাবু লাইটারটা জ্বাললেন। তাতে বিশেষ কিছুই দেখা গেল না। শুধু জমাট অন্ধকার।

—সন্তু, দ্যাখ তো, শুকনো গাছটাছ আছে কিনা, যাতে আগুন জ্বালা যায় !

শুকনো গাছও নেই। বরং সব কিছুই ভিজে স্যাঁতসেঁতে। পাথরের দেয়ালে হাত দিলেও হাতে জল লাগে।

কাকাবাবু অধীর হয়ে বললেন, কী মুশকিল, আগুন জ্বালাবার কিছু নেই ? টর্চটা আনলে হতো—বুঝবোই বা কী করে, দিনের বেলা—

আমি বললাম, কাকাবাবু, এখন আমরা ওপরে উঠে পড়ি বরং। পরে লোকজন ডেকে এনে দেখলে হয় না ?

কাকাবাবু প্রায় ধমক দিয়ে বললেন, না ! এসব লোকজন ডেকে এনে দেখার জিনিস নয়।

আমি বললাম, কাকাবাবু ঐ সুড়ঙ্গটার মধ্যে একটা বিচ্ছিরি গন্ধ !

কাকাবাবু নাকে বড় রকম নিঃশ্বাস টেনে বললেন, গন্ধ ? কই, আমি পাচ্ছি না তো ! অবশ্য, আমার একটু সর্দি হয়েছে। গন্ধ থাক না, তাতে কি হয়েছে ?

কাকাবাবু ঝট করে পকেট থেকে বড় একটা রুমাল বার করলেন।

তারপর সেটাতেই লাইটার থেকে একটু পেট্রোল ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলেন। রুমালটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। সেই আলোতে দেখা গেল গুহাটা বেশী বড় নয়। কাকাবাবু মাথা নিচু করে ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন, আমি দারুণ ভয় পেয়ে কাকাবাবুকে টেনে ধরে চেঁচিয়ে উঠলাম, কাকাবাবু, দ্যাখো, দ্যাখো—

গুহার একেবারে শেষ দিকে দুটো চোখ আগুনের মতন জ্বলজ্বল করছে। আমার তক্ষুনি মনে হলো, হাকো বসে আছে ওখানে। আমি প্রথমেই ভেবেছিলাম, এটা হাকোর বাড়ি। ও বেরিয়ে এসেই আমাদের পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।

কাকাবাবু একটু থমকে গেলেন। আমি ফিসফিস করে বললাম, হাকো ! নিশ্চয়ই হাকো ! ওরা বলেছিল কুয়োর মধ্যে...

কাকাবাবু বললেন, ধ্যাৎ ! হাকো আবার কী ? তোর মাথার মধ্যে বুঝি ঐ সব গল্প ঢুকেছে !

—তা হলে কী ? চোখ দুটোতে আগুন জ্বলছে—

—আগুন কোথায় ? আলো পড়ে চকচক করছে।

—তবে কি বাঘ ?

—এত ঠাণ্ডা জায়গায় বাঘ থাকে না। খুব সম্ভব পাহাড়ী সাপ। পাইথন-টাইথন হবে। ভয়ের কিছু নেই। পাইথন তেড়ে এসে কামড়ায় না !

রুমালটা ততক্ষণে সবটা পুড়ে এসেছে। বিশ্রী গন্ধ আর ধোঁয়া বেরুচ্ছে সেটা থেকে। ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে এসেছে, ধোঁয়ার জন্য আবার কাশি পেয়ে গেল।

কাকাবাবু হুকুম করলেন, সন্তু, তোমার পকেট থেকে রুমাল বার করো। আমি আগুন লাগিয়ে দিচ্ছি, তুমি ধরে থাকো ওটা। এক পাশে সরে গিয়ে হাতটা শুধু বাড়িয়ে দাও গুহাটার দিকে।

কাকাবাবু রিভলবারটা বার করে বললেন, বেচারাকে মারা উচিত নয়, ও চুপ করে বসে ছিল, আমাদের কোনো ক্ষতি করেনি। কিন্তু সাপকে তো বিশ্বাস করা যায় না। আমাকে যে ভেতরে ঢুকতেই হবে।

—যদি সাপ না হয় ?

—সাপ ছাড়া আর কোনো জন্তু এতক্ষণ চুপ করে বসে থাকে না।

কাকাবাবু সেই চোখ দুটো লক্ষ্য করে পর পর দুবার গুলি করলেন। হঠাৎ গুহাটার মধ্যে তুমুল কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। এতক্ষণ অন্ধকারে টুঁ শব্দটিও ছিল না। এখন গুহাটার ভেতরে কে যেন

প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে দাপাদাপি করছে।

কাকাবাবু চেঁচিয়ে বললেন, সন্তু, সরে দাঁড়াও, গুহার মুখটা থেকে সরে দাঁড়াও। ও এখন বেরুবার চেষ্টা করবে!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাপটার বীভৎস মুখখানা গুহা থেকে বেরিয়ে এলো। অনেকটা থেঁতলে গেছে। কাকাবাবু আবার দুটো গুলি ছুঁড়লেন।

আস্তে আস্তে থেমে গেল সব ছটফটানি। আমি উল্টো দিকের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছি। তাড়াতাড়ি পিছু হটতে গিয়ে মাথা ঠুকে গেল দেয়ালে। এত জোরে বুক ঢিপঢিপ করছে যে মনে হচ্ছে কানে তালা লেগে যাবে। পা দুটো কাঁপছে থরথর করে।

কাকাবাবু এগিয়ে গিয়ে জুতোর ঠোক্কর দিয়ে দেখলেন সাপটার তখনও প্রাণ আছে কিনা। সেটা আর নড়লো না। আমি বললাম, কাকাবাবু, যদি ভেতরে আরও কিছু থাকে? সাপ কিংবা অন্য জন্তু-জানোয়ার সব একসঙ্গে দুটো করে থাকে না?

—আর কিছু থাকলে এতক্ষণে বেরিয়ে আসতো।

তারপরেই কাকাবাবু গুহাটার মধ্যে ঢুকে পড়লেন। আমি বারণ করার সময় পেলাম না। তখন দিশেহারা হয়ে গিয়ে আমিও ঢুকে পড়লাম পেছন পেছন।

এই মশালটাও প্রায় পুড়ে এসেছে। হাতে ছেঁকা লাগার ভয়ে আমি সেটাকে ফেলে দিলাম মাটিতে। সেই আলোতে দেখা গেল গুহার মধ্যে একটা মানুষের কঙ্কালের টুকরো পড়ে আছে। শুধু মুণ্ডু আর কয়েকখানা হাড়। একটা ভাঙা মাটির হাঁড়ি, একটা মস্ত বড় লম্বা বর্শা। আর একটা চৌকো তামার বাক্স।

কাকাবাবু সেই তামার বাক্সটা তুলে নিয়েই বললেন, সন্তু, শিগগির বাইরে চলে এসো। এই বন্ধ গুহার মধ্যে আগুন জ্বালা হয়েছে, এখানকার অকসিজেন ফুরিয়ে আসছে। এক্ষুনি দম বন্ধ হয়ে আসবে। চলে এসো শিগগির।

ঝোলানো দড়ি ধরে দেয়ালের শিকড়-বাকড়ে পা দিয়ে একেবারে ওপরে উঠে এলাম। আগে আমি, তারপর কাকাবাবু। কাকাবাবু খোঁড়া পা নিয়ে কত কষ্ট করে যে উঠলেন, তা অন্য কেউ বুঝবে না। কিন্তু কাকাবাবুর মুখে কষ্টের কোনো চিহ্ন নেই। আমিও তখন বিপদ কিংবা কষ্টের কথা ভুলে গেছি। বাক্সটার মধ্যে কী আছে তা দেখার জন্য আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারছি না। কত অ্যাডভেঞ্চার

সন্তু, সরে দাঁড়াও, গুহার মুখটা থেকে সরে দাঁড়াও। ও এখন বেরুবার চেষ্টা করবে।

বইতে পড়েছি, এইরকম ভাবে গুপ্তধন খুঁজে পাবার কথা। আমরাও ঠিক সেই রকম...বাক্সটার মধ্যে মণিমুক্তো, জহরৎ যদি ভর্তি থাকে—

কাকাবাবু টানাটানি করে বাক্সটা খোলার চেষ্টা করলেন। কিছুতেই খোলা যাচ্ছে না। তালা বন্ধও নয়, কিন্তু কীভাবে যে আটকানো তা-ও বোঝা যায় না। আমি একটা বড় পাথর নিয়ে এলাম। সেটা দিয়ে ঠুকে ঠুকে একটা কোণ ভেঙে ফেলা হলো। বাক্সটা অবশ্য বহুকালের পুরোনো, জোরে আছাড় মারলেই ভেঙে যাবে। ভাঙা দিকটায় ছুরি ঢুকিয়ে চাড় দিতেই ডালাটা উঠে এলো।

বাক্সটার ভেতরে তাকিয়ে আমি একেবারে নিরাশ হয়ে গেলাম। মণি, মানিক্য, জহরৎ কিছুই নেই। কেউ যেন আমাদের ঠকাবার জন্যই বাক্সটা ওখানে রেখে গেছে। বাক্সটার মধ্যে শুধু একটা বড় গোল পাথর, গায়ে শ্যাওলা জমে গেছে। কেউ বোধহয় আমাদের আগে ঐ গুহাটায় ঢুকে বাক্সটা খুলে মণিমুক্তো সব নিয়ে তারপর অন্যদের ঠকাবার জন্য ভরে রেখে গেছে।

কিন্তু আমি কিছু বলবার আগেই দেখলাম, কাকাবাবুর মুখে দারুণ আনন্দের চিহ্ন। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। ঠোঁটে অদ্ভুত ধরনের হাসি। কাকাবাবু চোখ থেকে চশমাটা খুলে ফেললেন। আমি ভাবলাম চশমার কাচ মুছবেন। কিন্তু তা তো নয়? মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে বাক্সটা হাতে নিয়ে কাকাবাবু হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন।

মূর্তি রহস্য

চোখ মুছে কাকাবাবু বললেন, সন্তু, এতদিনের কষ্ট আজ সার্থক হলো। কতদিন ধরে আমি এর স্বপ্ন দেখেছি। নিজেরও বিশ্বাস ছিল না, সত্যিই কোনোদিন সফল হবো। তোর জন্যই এটা পাওয়া গেল, তোর নামও সবাই জানবে।

আমি কিছুই বুঝতে না পেরে কাকাবাবুর পাশে বসে পড়লাম। কাকাবাবু খুব সাবধানে পাথরটা তুললেন। এবার আমি লক্ষ করলাম, ওটা ঠিক সাধারণ পাথর নয়, অনেকটা মানুষের মুখের মতন। যদিও কান দুটো আর নাক ভাঙা। সেই ভাঙা টুকরোগুলোও বাক্সের মধ্যে পড়ে আছে। বোধহয় অজগরটার লেজের ঝাপটায় বাক্সটা ওলটপালট হয়েছে, সেই সময় ভেঙে গেছে। কিংবা আগেও ভাঙতে পারে।

কাকাবাবু রুমাল দিয়ে ঘষে ঘষে শ্যাওলা পরিষ্কার করে ফেলার পর মুখচোখ ফুটে উঠলো। গলার কাছ থেকে ভাঙা। গোটা মূর্তি থেকে শুধু মুণ্ডুটা ভেঙে আনা হয়েছে। বহুকালের পুরোনো মূর্তি, এমন কিছু দেখতে সুন্দরও নয় যে আলমারিতে সাজিয়ে রাখা যায়। এটার জন্য কাকাবাবু এত বাড়াবাড়ি করছেন কেন?

কাকাবাবু ছুরি দিয়ে মুণ্ডুটার গলার কাছে খোঁচাতে লাগলেন। ঝুরঝুর করে মাটি খসে পড়ছে। অর্থাৎ মুণ্ডুটা ফাঁপা, মাটি দিয়ে ভরে রাখা হয়েছে। এখনও ভাবছি, তাহলে বোধহয় এই মুণ্ডুটার ভেতরে খুব দামী কোনো জিনিস লুকানো আছে। হীরে মুক্তো যদি না-ও থাকে, তবুও কোনো গুপ্তধনের নক্সা অন্তত পাওয়া যাবে। কিন্তু কিছুই বেরুলো না, শুধু মাটিই পড়তে লাগলো। একেবারে সাফ হয়ে যাবার পর, ভেতরটা ভালো করে দেখে নিয়ে কাকাবাবু আর একবার খুশী হয়ে উঠলেন। আমার দিকে ফিরে বললেন, সব মিলে যাচ্ছে। ভেতরে কী সব লেখা আছে দেখতে পাচ্ছিস তো? আমি অবশ্য এই লিপির পাঠোদ্ধার করতে পারবো না—কিন্তু পণ্ডিতরা দেখলে...। আমি সোনার খনি কিংবা গন্ধকের খনি আবিষ্কার করতে আসিনি, এটা খুঁজতেই এসেছিলাম। এটার কাছে সোনা, রুপো তুচ্ছ।

আমি জিগ্যেস করলাম, কাকাবাবু, এটা কার মুণ্ডু?

—সম্রাট কনিষ্কর নাম শুনেছিস? পড়েছিস ইতিহাস?

—হ্যাঁ, পড়েছি।

—সম্রাট কনিষ্ককে দেখতে কী রকম ছিল, কেউ জানে না। কয়েকটা প্রাচীন মুদ্রায় তাঁর মুখের খুব ঝাপসা ছবি দেখা গেছে—কিন্তু তাঁর কোনো পাথরের মূর্তিরই মুখ নেই। এই সেই মুখ। তুই আর আমি প্রথম তাঁর মুখ আবিষ্কার করলাম। শুধু মুখ নয়—তাঁর জীবনের সব কথা। ইতিহাসের দিক থেকে এর যে কী বিরাট মূল্য, তুই এখন হয়তো বুঝবি না, বড় হয়ে বুঝবি। সারা পৃথিবীর ঐতিহাসিকদের মধ্যে দারুণ সাড়া পড়ে যাবে!

—কিন্তু এটা যে সত্যিই কনিষ্কর মাথা, তা কী করে বোঝা যাবে?

—ঐ যে মাথার ভেতরে সব লেখা আছে!

ব্যাপারটার গুরুত্ব আমি তখনও ঠিক বুঝতে পারিনি। কিছুই ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। আমি বললাম, যদি কেউ যে-কোনো একটা মুণ্ডু বানিয়ে তার মধ্যে কিছু লিখে দ্যায়, তাহলেই কি সবাই বিশ্বাস করবে?

কাকাবাবু বললেন, লেখার ধরন দেখে, ভাষা দেখে, মূর্তির গড়ন দেখে পণ্ডিতরা তার বয়েস বলে দিতে পারে। ওসব বোঝা খুব শক্ত নয়।

কিন্তু মূর্তির মাথার মধ্যে কিছু লেখা থাকে—আগে তো কখনও শুনিনি। তা ছাড়া, কনিষ্কর মাথা এই গুহার মধ্যে এলো কী করে?

—শোন, তা হলে তোকে গোটা ব্যাপারটা বলি, একটা প্রায় অবিশ্বাস্য ব্যাপার। পৃথিবীতে এরকম চমকপ্রদ ঐতিহাসিক আবিষ্কার খুব কমই হয়েছে। পিরামিডের লিপি কিংবা হিট্টাইট সভ্যতা আবিষ্কারের সময় যে-রকম হয়েছিল, অনেকটা সেই রকম।

কাকাবাবু পাথরের মুণ্ডুটা সাবধানে রাখলেন সেই বাক্সের ভেতরে। আরাম করে একটা চুরুট ধরালেন। মুখে সার্থকতার হাসি। বললেন, তুই পাইথনটা দেখে খুব ভয় পেয়েছিলি, না?

আমি উত্তর না দিয়ে মুখ নিচু করলাম। ভাবতে গেলেই এখনো বুক কাঁপে।

—রিভলবার-বন্দুক থাকলে পাইথন দেখে ভয় পাবার বিশেষ কারণ নেই। বাঘ, হায়না হলেই বরং বিপদ বেশী। বেচারা ওখানে নিশ্চিন্তে বাসা বেঁধেছিল, বসে বসে রাজার মুণ্ডু পাহারা দিচ্ছিল। মরণ ছিল আমার হাতে।

—কাকাবাবু, তুমি কী করে জানলে যে মুণ্ডুটা এই রকম একটা গুহার মধ্যে থাকবে?

—বছর চারেক আগে আমি একটা কনফারেন্সে যোগ দিতে জাপানে গিয়েছিলাম, তোর মনে আছে তো?

—হ্যাঁ, মনে আছে।

—ফেরার পথে আমি হংকং-এ নেমেছিলাম। হংকং-এ আমি কিছু বইপত্তর আর পুরোনো জিনিস কিনেছিলাম—সেখানে একটা দোকানে ঘাঁটতে ঘাঁটতে আমি একটা বহু পুরোনো বই পেয়ে যাই। বইটা চতুর্থ শতাব্দীতে একজন চীনা ডাক্তারের লেখা। ডাক্তারটির সুনাম ছিল পাগলের চিকিৎসায়। ডাক্তারী বই হিসেবে বইটার এখন কোনো দাম নেই, কারণ যে-সব চিকিৎসার কথা তিনি লিখেছেন, তা শুনলে লোকে হাসবে। যেমন, এক জায়গায় লিখেছেন, যে-সব পাগল বেশী কথা বলে কিংবা চিৎকার করে তাদের পরপর কয়েকদিন পায়ে দড়ি বেঁধে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখলে পাগলামি সেরে যায়! আর এক জায়গায় লিখেছেন, পাগলরা উল্টোপাল্টা কথা বললেই তাদের কানের

সামনে খুব জোরে জোরে ঢাক ঢোল পেটাতে হবে। সেই আওয়াজের চোটে তাদের কথা শোনা যাবে না। বেশীদিন কথা না বলতে পারলেই তাদের পাগলামি আপনি আপনি সেরে যাবে।

চুরুট নিভে গিয়েছিল বলে কাকাবাবু সেটা ধরাবার জন্য একটু থামলেন। আমি এখনো অগাধ জলে। চীনে ডাক্তারের লেখা বইয়ের সঙ্গে সম্রাট কনিষ্কের মুণ্ডু উদ্ধারের কী সম্পর্ক কিছুই বুঝতে পারছি না।

কাকাবাবু চুরুটে কয়েকবার টান দিয়ে আবার শুরু করলেন, যাই হোক, ডাক্তারী বই হিসেবে দাম না থাকলেও বইটাতে নানান দেশের পাগলদের ব্যবহার সম্পর্কে অনেক গল্প আছে, সেগুলো পড়তে বেশ মজা লাগে। তারই মধ্যে একটা গল্প দেখে আমার মনে প্রথম খটকা লেগেছিল। ঐ ডাক্তারেরই পরিবারের একজন নাকি দু-এক শো বছর আগে চীনের সম্রাটের প্রতিনিধি হয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তিনি তাঁর নথিপত্রে একজন ভারতীয় পাগলের কথা লিখে গেছেন—কালিকট বন্দরের রাস্তায় পাগলটা হাতে শিকল বাঁধা অবস্থায় থাকতো, আর সর্বক্ষণ চেঁচাতো—সম্রাট কনিষ্কের মুণ্ডু নিয়ে আমার বন্ধু একটা চৌকো ইঁদারায় বসে আছে, আমাকে সেখানে যেতে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও! পাগলের কল্পনা কত উদ্ভট হতে পারে সেই হিসেবেই ডাক্তার-লেখকটি এই গল্পের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন—চার পাঁচ পাতা জুড়ে আছে সেই বর্ণনা। ঘটনাটি সত্যি অদ্ভুত। সম্রাট কনিষ্ক মারা গেছেন স্বাভাবিক ভাবে—তাঁর মৃত্যুর বেশ কিছুদিন পর যদি কেউ বলে তাঁর এক বন্ধু কনিষ্কের মুণ্ডু নিয়ে একটা চৌকো ইঁদারায় বন্দী হয়ে আছে—তাহলে তার কল্পনা শক্তি থেকে অবাক হবারই কথা। পাগলদের মধ্যে এ খুব উঁচু জাতের পাগল। চীনা ডাক্তার তাই ওর কথা সবিস্তারে লিখেছেন। ঘটনাটা যে ভাবে ঐ বইতে আছে সেটা বললে তুই বুঝবি না। চীনে ভাষায় নামটাম অনেক বদলে গেছে, জায়গার নাম ওলোট পালোট হয়ে গেছে। যাই হোক, ঐ লেখাটার সঙ্গে ইতিহাসের কিছু কিছু ঘটনা মিলিয়ে আমার কাছে যে ভাবে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো, সেটাই তোকে বলছি।

কনিষ্কর কথা তো ইতিহাসে একটু একটু পড়েছিস। কুষাণ সাম্রাজ্যের সবচেয়ে শক্তিশালী সম্রাট ছিলেন এই প্রথম কনিষ্ক। খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে উনি রাজত্ব করেছিলেন। এশিয়ার অনেকগুলো দেশ ছিল ওঁর অধীনে, আমাদের ভারতবর্ষেরও প্রায়

দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল কনিষ্কর শাসন। অন্যান্য রাজারা ওঁকে এমন ভয় পেত যে বিভিন্ন দেশের রাজপুত্রদের সম্রাট কনিষ্ক নিজের রাজ্যে নজরবন্দী করে রাখতেন বলে শোনা যায়। শুধু যে বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিল কনিষ্কর তাই-ই নয়, সম্রাটের নিজেরও অনেক অলৌকিক ক্ষমতা ছিল বলে তখনকার লোকে বিশ্বাস করতো। পণ্ডিত সিলভাঁ লেভি কনিষ্ক সম্পর্কে এই রকম একটা উপাখ্যানের উল্লেখ করেছেন। আল বেরুনি-ও প্রায় একই রকম একটা কাহিনী বলেছেন তাঁর তাহকিক-ই-হিন্দ বইতে। চীনে ডাক্তারের সেই পাগলের গল্পের সঙ্গেও এসবের মিল আছে। তাই আমি কৌতূহলী হয়েছিলাম।

গল্পটা হচ্ছে এই। গান্ধারের সম্রাট কনিষ্ক ভারত আক্রমণ করে একটার পর একটা রাজ্য জয় করে চলেছেন। প্রবল তাঁর প্রতাপ, প্রাচ্য দেশের প্রায় সব রাজাই তাঁর নামে ভয় পায়। এদিকে তিনি রাজ্য জয় করে চলেছেন—আবার ধর্মের উন্নতির জন্য তিনি বৌদ্ধদের একটা মহা সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন—এমন কথাও শোনা যায়। প্রজাদের কাছ থেকে তিনি ভয় ও ভক্তি এক সঙ্গে আদায় করে নিতে জানতেন। যাই হোক, এই সময় একদিন কেউ একজন তাঁকে খুব সুন্দর দুটি কাপড় উপহার দেয়। কাপড় দুটো দেখে সম্রাট কনিষ্ক মুগ্ধ হলেন, একটা নিজের জন্য রেখে আর একটা পাঠিয়ে দিলেন রানীকে।

তারপর একদিন রানী সেই কাপড়খানা পরে সম্রাটের সামনে এসেছেন, সম্রাট তাকে দেখেই চমকে উঠলেন। রানীর ঠিক বুকের মাঝখানে কাপড়টার ওপরে গেরুয়া রঙে মানুষের হাত আঁকা।

রাজা ভুরু কুঁচকে জিগেস করলেন, রানী! এ কী রকম শাড়ি পরেছো তুমি? ঐ হাতটা আঁকার মানে কী?

রানী বললেন, মহারাজ, এই কাপড়টা আপনিই পাঠিয়েছেন, আপনাকে খুশী করার জন্যই আমি আজ এটা পরেছি। আগে থেকেই কাপড়টাতে এই রকম হাত আঁকা ছিল।

শুনেই সম্রাট খুব রেগে গেলেন। তবে কি কেউ সম্রাটকে পুরোনো কাপড় উপহার দিয়ে গেছে? কারুর এতখানি স্পর্ধা হবে, এ তো ভাবাই যায় না! রাজকোষের রক্ষককে ডেকে সম্রাট জিগেস করলেন, এর মানে কী? কে এই হাতের ছাপ এঁকেছে?

রাজকোষের রক্ষক বললেন, মহারাজ, এই ধরনের সব কাপড়ের

ওপরেই এই রকম হাতের ছাপ আঁকা থাকে।

সম্রাট হুকুম দিলেন, এই কাপড় যে উপহার দিয়েছে, তাকে ডাকো!

ডাকা হলো তাকে। সে বেচারী এসে ভয়ে ভয়ে বললো, সে এ সম্পর্কে কিছুই জানে না। একজন বিদেশী বণিকের কাছে এই কাপড় দেখে তার খুব পছন্দ হয়েছিল, তাই উপহার এনেছিল সম্রাটের জন্য।

সম্রাট কনিষ্ক ব্যাপারটা সম্পর্কে খুবই কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন, যেমন করে পারো, ধরে আনো সেই বণিককে। অশ্বারোহী সৈনিকরা ছুটে গেল। দুদিনের মধ্যেই সেই বণিককে ধরে এনে হাজির করলে সম্রাটের সামনে। দেখা গেল, বণিকের কাছে অনেক সুন্দর সুন্দর কাপড় আছে, কিন্তু সবগুলিতেই ঐ রকম গেরুয়া রঙের হাতের ছাপ আঁকা রয়েছে।

সম্রাট বললেন, বণিক, যদি সত্যিকথা বলো, তোমার ভয় নেই। কোথা থেকে এমন সুন্দর কাপড় পেয়েছো? কেনই বা এতে মানুষের হাতের ছাপ আঁকা।

বণিক ভয়ে ভয়ে হাতজোড় করে বললো, মহারাজ, এই কাপড় আমি এনেছি দক্ষিণ ভারত থেকে। সেখানে সাতবাহন নামে এক রাজা আছেন। প্রত্যেক বছর এই কাপড় তৈরী করার পর সেই রাজার কাছে আনা হয়। তিনি সমস্ত কাপড়ের ওপরে নিজের হাতের ছাপ এঁকে দেন। ছাপটা ঠিক এমনভাবে পড়ে যে কোনো পুরুষ এই কাপড় পরিধান করলে ছাপটা থাকবে ঠিক তার পিঠে, আর কোনো মেয়ে পরিধান করলে থাকবে তার বুকে।

সম্রাটের ভ্রূ কুঞ্চিত হলো, রাগে থমথমে হলো মুখ। রাজসভার অমাত্যদের বললেন, কাপড়গুলো পরে দেখতে। বণিকের কথাই সত্যি, প্রত্যেকের পিঠেই হাতের ছাপ।

সম্রাট কনিষ্ক কোষ থেকে তলোয়ার খুলে মেঘ গর্জনের মত গম্ভীর গলায় বললেন, ঐ হাত কাটা অবস্থায় আমি দেখতে চাই। এখুনি দূত চলে যাক দাক্ষিণাত্যে, গিয়ে সেই উদ্ধত রাজা সাতবাহনকে বলুক, সে তার দুটো হাত ও দুটো পা কেটে যদি আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়, তাহলে আমি তার রাজ্য আক্রমণ করবো না। যদি না দেয়, তাহলে শীঘ্রই আমি আসছি।

দূত ছুটে গেল সাতবাহনের রাজ্যে। তখন সম্রাট কনিষ্কর

সেনাবাহিনীকে ভয় করে না এমন কোনো রাজা নেই। কনিষ্কের সঙ্গে যুদ্ধে জেতার কোনোই আশা নেই সাতবাহনের। কিন্তু সাতবাহনের মন্ত্রীরা রাজাকে খুব ভালোবাসতেন। রাজাকে বাঁচাবার জন্য তাঁরা সবাই মিলে একটা বুদ্ধি বার করলেন! তাঁরা দূতকে বললেন, আমাদের রাজা সাতবাহন বড্ড ভালো মানুষ, তিনি রাজকার্য কিছুই দেখেন না। তিনি কখন কোথায় থাকেন, তাও জানা যায় না। আমরা মন্ত্রীরাই রাজ্য চালাই। সম্রাটকে জিগ্যেস করে এসো, আমরা কি আমাদের সবার হাত পা কেটে পাঠাবো?

সম্রাট কনিষ্ক দূতের মুখে সেই কথা শুনে বললেন, সৈন্য সাজাও। আমি নিজে ওদের শিক্ষা দিতে যাবো। হাতি, ঘোড়া, রথ নিয়ে কনিষ্কর বিরাট সৈন্যবাহিনী চললো দাক্ষিণাত্যে।

সাতবাহন রাজার মন্ত্রীরা সেই খবর শুনে রাজাকে লুকিয়ে রাখলেন মাটির তলায় একটা গোপন গুহায়। তারপর সোনা দিয়ে অবিকল সাতবাহনের মতন একটা মূর্তি বানিয়ে তাতেই রাজার পোশাক পরিয়ে নিয়ে গেলেন বাহিনীর সামনে। কনিষ্ক সেই মূর্তি-টাকে বন্দী করে ছলনা বুঝতে পারলেন। তখন তিনি বরুহাস্যে সাতবাহন রাজার মন্ত্রীদের বললেন, তোমরা শুধু আমার সেনা-বাহিনীর ক্ষমতা দেখেছো, আমার নিজস্ব ক্ষমতা এখনো দেখোনি। এইবার সেটা দ্যাখো।

সম্রাট কনিষ্ক নিজের তলোয়ার দিয়ে সেই সোনার মূর্তির হাত ও পা দুটো কেটে ফেললেন। আর ঠিক সঙ্গে সঙ্গে সেই মুহূর্তেই অলৌকিক উপায়ে মাটির নিচে গুহার মধ্যে লুকিয়ে থাকা সাতবাহন রাজার হাত ও পা দুটোও কেটে পড়ে গেল।

আল বেরুনি যে কাহিনী বলেছেন, সেটা একটু অন্যরকম। কিন্তু তাতে সম্রাট কনিষ্কর আরও বেশী অলৌকিক শক্তির পরিচয় আছে। সেখানে কনিষ্ককে বলা হয়েছে পেশোয়ারের রাজা কনিষ্ক আর সাতবাহনের জায়গায় আছে কনৌজের রাজা। এবং কাপড়ের ওপরে হাতের ছাপের বদলে পায়ের ছাপ। যাই হোক, এটাও যে কনিষ্ক সম্পর্কে উপাখ্যান তা ঠিক বোঝা যায়। এতেও দেখা যায়, কনৌজের রাজার এক বিশ্বস্ত মন্ত্রী রাজাকে বাঁচাবার জন্য লুকিয়ে রেখে, বিশ্বাসঘাতকের ভান করে কনিষ্কর সেনাবাহিনীকে ভুলিয়ে নিয়ে যায় মরুভূমির মধ্যে। সেখানে জলের অভাবে সৈন্যরা হাহাকার করতে লাগলো, যুদ্ধে হেরে যাবার মতন অবস্থা। তখন মহাপরাক্রান্ত

সম্রাট কনিষ্ক সেই মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, তোমার ধারণা, আমি শুধু সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে এতবড় সাম্রাজ্য গড়েছি? এইবার আমার নিজের ক্ষমতা দ্যাখো!

সম্রাট কনিষ্ক তখন প্রকাণ্ড এক বর্শা নিয়ে সাংঘাতিক জোরে সেই মরুভূমির মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেখান দিয়ে ঝর্ণার জলের ধারা বেরিয়ে এলো। কনিষ্ক সেই মন্ত্রীকে বললেন, যাও, এবার তোমার রাজার কাছে যাও। গিয়ে দেখে এসো, সেই রাজা এখন কেমন আছে। মন্ত্রী গিয়ে দেখলেন, লুকিয়ে থাকা অবস্থাতেই কনৌজের রাজার হাত পা কেটে টুকরো হয়ে পড়ে আছে। কনিষ্ক যে আগেও অনেকবার এরকম অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়েছেন, তারও উল্লেখ আছে। তখনকার দিনে লোকের ধারণা হয়ে গিয়েছিল, কনিষ্ক শুধু সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে যুদ্ধে জেতেন না। তাঁর মাথাটাই সব—আশ্চর্য তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা।

আবার চুরুট জ্বালিয়ে কাকাবাবু বললেন, এর পরের ঘটনা আমি পেয়েছি চীনে ডাক্তারের লেখা সেই পাগলের কাহিনী থেকে। অর্থাৎ কিছু কিছু ঘটনা পেয়েছি সেই পাগলের গল্প থেকে—তার সঙ্গে অন্য উপাদান মিলিয়ে আমি ব্যাপারটা জুড়ে নিয়েছি। সাতবাহন রাজার মৃত্যুর পর তাঁর রাজ্য ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, বংশের লোকেরা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে থাকে। কিন্তু রাজপরিবার ও মন্ত্রীপরিবারের কয়েকজন পুরুষ ঐ অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য দারুণ প্রতিজ্ঞা করে। তারা ঠিক করে, ছদ্মবেশ ধরে বা যে-কোনো উপায়েই হোক, তারা কনিষ্ককে গুপ্তহত্যা করবে—এজন্য তারা জীবন দিতেও প্রস্তুত। এই জন্য একদল লোক ছড়িয়ে পড়ে উত্তর ভারতে, এমন কি ভারতের বাইরেও তারা যায়। কনিষ্ক যখন যেখানে যাবেন, তারা তাঁকে সেখানেই খুন করার চেষ্টা করবে। কিন্তু কনিষ্কর মতন এতবড় একজন সম্রাটের রক্ষীবাহিনীকে অতিক্রম করে তাঁকে খুন করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তারা শেষ পর্যন্ত কনিষ্ককে খুন করতে পারেনি। এদিকে অহংকারী সম্রাট কনিষ্ক তাঁর জীবিতকালেই নিজের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, তাঁর মস্তিষ্কের অলৌকিক শক্তির জন্যই তাঁর এত প্রতিষ্ঠা। সেইজন্য তাঁর বিশেষ নির্দেশে তাঁর মূর্তির মাথার ভেতরে তাঁর কীর্তিকাহিনী সব খোদাই করে রাখা হয়। সাতবাহন বংশের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ পুরুষরা কনিষ্ককে হত্যা করতে না পেরে তাঁর মূর্তির মুণ্ডু ভেঙে নিয়ে যায়। কনিষ্কর যে দুটি

মূর্তি পাওয়া গেছে, দুটিরই মাথা এই জন্য ভাঙা।

চীনে ডাক্তার সেই পাগলের কাহিনীতে ভেবেছিলেন বুঝি পাগলটা সত্যিকারের কনিষ্কর কাটামুণ্ডুর কথা বলতো। কিন্তু কনিষ্ক যে সেভাবে মারা যায়নি, তা সেকালের সবারই জানা ছিল। পড়ে আমার মনে হলো, আসলে পাথরের মূর্তির মাথার কথাই বলেছিল সে।

ব্যাপারটা হয়েছিল এই রকম। সাতবাহন বংশের সেই পুরুষরা নিজেদের নাম দিয়েছিল সপ্তক বাহিনী। মহাভারতে যেমন সংসপ্তকদের কথা আছে—অর্থাৎ যারা নিজের জীবন দিয়েও প্রতিজ্ঞা পালন করতে চায়। সেই সপ্তক বাহিনীর দুজন লোক চলে যায় কান্দাহার পর্যন্ত। সেখান থেকে কনিষ্ক মূর্তির মাথাটা ভেঙে নেয়। তাদের ইচ্ছে ছিল সেই ভাঙা মুণ্ডু সাতবাহন রাজার বিধবা রানীর পায়ের কাছে রাখবে। তিনি সেটাতে পদাঘাত করে শোকের জ্বালা কিছুটা জুড়োবেন। কিন্তু কাশ্মীরের কাছে এসে তারা আটকে যায়। এটাই ছিল তখন যাতায়াতের রাস্তা। ফেরার পথে যখন তারা কাশ্মীরে এসে পৌঁছয়, তখন এখানে দারুণ গৃহযুদ্ধ বেধে গেছে। রাজ-তরঙ্গিনীতে উল্লেখ আছে যে, কাশ্মীরেও একজন রাজার নাম ছিল কনিষ্ক। সেই কনিষ্ক আর আমাদের কনিষ্ক যদি এক হয় তা হলে কনিষ্কর মৃত্যুর পর এখানে হানাহানি শুরু হয়ে যাওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়। এখানে তখন বিদেশী দেখলেই বন্দী কিংবা হত্যা করা হচ্ছে। সপ্তক বাহিনীর লোক দুটি পড়লো মহাবিপদে। তারা দক্ষিণ ভারতের মানুষ, তাদের চেহারা দেখলেই চেনা যাবে। গণ্ডগোল কমার অপেক্ষায় তারা এখানে এক জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। মাটিতে গভীর গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে লুকিয়ে থাকে।

কতদিন তাদের সেই গর্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল, তা বলা শক্ত। কাশ্মীরে তখন চরম অরাজকতা চলছিল, তার মধ্যে বিদেশী মানুষ হিসেবে তাদের বিপদ ছিল খুবই। কিন্তু দিনের পর দিন তো মানুষ আর গর্তের মধ্যে বসে থাকতে পারে না। তাদের মধ্যে একজন নিশ্চয়ই পালা করে বেরুতো রাত্তিরবেলা। খাবারদাবার সংগ্রহ করতো, খোঁজখবর আনতো। আমার কি মনে হয় জানিস, এখানকার গ্রামে যে হাকো সম্পর্কে গল্প প্রচলিত আছে—সেটা ঐ সপ্তক বাহিনীর একজন সম্পর্কে হওয়া আশ্চর্য কিছু নয়। রাত্তিরবেলা এই শীতে এখানে কেউ ঘোড়া চালায় না। সেকালে কেউ হয়তো মধ্য রাতে

একজন অশ্বারোহীকে দেখে ফেলেছিল, তার হাতে থাকতো মশাল—অমনি এক অলৌকিক গল্প। প্রাকৃতিক কারণে এখানকার পাহাড়-টাহারে কোথাও বোধহয় ঘোড়ার ক্ষুরের মতন শব্দ হয়—তার সঙ্গে ঐ কাহিনী মিশিয়ে ফেলেছে। সপ্তক থেকে হাকো হওয়া অসম্ভব নয়। মুখে মুখে উচ্চারণ এ রকম অনেক বদলে যায়। এখানে যে-জায়গাটার নাম এখন বানীহাল, আগে নাকি সেটার নাম ছিল বনশালা।

সেই দুজনের মধ্যে একজন এক রাত্তিরবেলা খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে এক দস্যুদলের হাতে ধরা পড়ে যায়। একা সে লড়াই করেও নিজেকে ছাড়াতে পারেনি। দস্যুদল তাকে কালিকট বন্দরে নিয়ে গিয়ে এক ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দেয়। তখন ক্রীতদাস প্রথা ছিল, জানিস তো? সেখানে লোকটি পাগল হয়ে যায়। আসলে তার সঙ্গী সেই গুহার মধ্যে সাহায্যের প্রতীক্ষায় বসে আছে—সে কোথায় চলে গেল জানতেও পারলো না—এই চিন্তাই তাকে পাগল করে দেয়। বিশেষত, সঙ্গী যদি ভাবে যে সে বিশ্বাসঘাতকতা করে পালিয়ে এসেছে—এই চিন্তাই বেশী কষ্ট দিত তাকে। কারণ, তখনকার দিনে মানুষ প্রতিজ্ঞার খুব দাম দিত। সেইজন্যই সে সব সময় চিৎকার করে করে ঐ কথা বলে সাহায্য চাইতো পথের মানুষের কাছে। এমন কি অন্য কেউ যদি তার কথা শুনে সাহায্য করতে যায়—এইজন্য জায়গাটা এবং গুহার বর্ণনাও সে চেঁচিয়ে বলতো। কিন্তু সবটাই গাঁজাখুরি কিংবা পাগলের প্রলাপ বলে লোকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। একটা গুহার মধ্যে একজন লোক সম্রাট কনিষ্কর কাটা মুণ্ডু নিয়ে বসে আছে, একথা কে বিশ্বাস করবে!

চীনে ডাক্তারের সেই লেখা আর ইতিহাসের অন্যান্য উপাদান মিলিয়ে আমি এই ব্যাপারটা মনে মনে খাড়া করেছিলাম। আর্কিও-লজিক্যাল সার্ভেতে কাজ করার সময়ও এই সব ব্যাপার নিয়ে আমি অনেক ঘাটাঘাটি করেছি। কিন্তু আর কারুকে বলিনি। ইতিহাসে এ-রকম অনেক বিস্ময়কর ব্যাপার আছে। কিন্তু প্রমাণিত না হলে কেউ বিশ্বাস করে না। আমারও এক এক সময় মনে হতো পুরো ব্যাপারটাই মিথ্যে। আবার কোন সময় মনে হতো—যদি সত্যি হয়, তাহলে ইতিহাসের একটা মহামূল্যবান জিনিস মাটির তলায় চাপা পড়ে থাকবে? তাই আমি নিজে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম।

চুরুটটা ফেলে দিয়ে কাকাবাবু বললেন, এই সামান্য পাথরের টুকরোটার কত দাম এখন বুঝতে পারছিস? এর ভেতরে খোদাই

করা লিপির যখন পাঠোদ্ধার হবে—ইতিহাসের কত অজানা তথ্য যে জানা হয়ে যাবে তখন! সাধারণ মানুষের কাছে এর কোনো মূল্য নেই। কিন্তু মানুষের ইতিহাসে এর যা দাম, তা টাকা দিয়ে যাচাই করা যায় না। তবে, টাকার দামেও এর অনেক দাম আছে। বিদেশের অনেক মিউজিয়াম এটা লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে কিনতে চাইবে। আমরা অবশ্য কারুর কাছে এটা বিক্রি করবো না, কি বলিস? আমরা ভারতের জাতীয় মিউজিয়ামকে এটা দান করবো। নানা দেশের মানুষ এটা দেখতে আসবে কলকাতায়। চল্, এবার আমাদের ফিরতে হবে।

আমি অভিভূতভাবে কাকাবাবুর গল্প শুনছিলাম। শুনতে শুনতে আমি চলে গিয়েছিলাম প্রাচীন ভারতের সেই সব জাঁকজমকের দিনে। চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছিলাম সম্রাট কনিষ্ককে। পুরু দুটি ঠোঁট, চোখের দৃষ্টিতে প্রচণ্ড অহংকার, চৌকো ধরনের চোয়াল আর গুপ্তক বাহিনীর সেই দুটি লোক। একজন মাটির তলার গুহায় পাথরের মূর্তিটি নিয়ে বসে আছে, আর একজন রাত্তিরবেলা ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে, হাতে মশাল...। কাকাবাবুর কথায় ঘোর ভেঙে গেল।

খুব সাবধানে বাক্সটা হাতে তুলে নিয়ে কাকাবাবু বললেন, শোন সন্তু, এসম্পর্কে এখন কারুকে একটা কথাও বলবি না। কারুকে না। আমরা আজই পহলগ্রামে ফিরে যাবার চেষ্টা করবো। যদি প্লেনের টিকিট পাওয়া যায়, কাল পরশুর মধ্যেই ফিরে যাবো দিল্লি। সেখানে প্রেস কনফারেন্স করে সবাইকে জানাবো। তার আগে এটা সাবধানে জমা রাখতে হবে সরকারের কাছে। সন্তু, আজ আমার বড় আনন্দের দিন। সারা জীবনে কখনো আমি এত আনন্দ পাইনি। মানুষ হয়ে জন্মালে অন্তত একটা কিছু মূল্যবান কাজ করে যাওয়া উচিত। এটাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ।

বিপদের পর বিপদ

গ্রামে ফিরে গিয়েই আমরা জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে রওনা হলাম সোনমার্গের দিকে। কাকাবাবু আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করতে রাজী নন। খাবারদাবার তৈরী হয়ে গিয়েছিল, সেগুলো আমরা সঙ্গে নিয়েই বেরিয়ে পড়লাম। কাকাবাবু বললেন, পথে কোনো নদীর ধারে বসে খেয়ে নিলেই হবে।

গ্রামের বেশ কয়েকজন লোক আমাদের সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর পর্যন্ত এলো। আমরা এ রকম হঠাৎ চলে যাবো শুনে তারা তো অবাক! কেনই বা ওদের গ্রামে থাকতে এসেছিলাম, কেনই বা চলে যাচ্ছি এত তাড়াতাড়ি, তা ওরা কিছুই বুঝলো না। ওরা আমাদের সম্পর্কে কি ধারণা করছে কে জানে! ওরা কেউ বাংলাদেশের নাম শোনেনি—কলকাতা শহরের নাম শুনেছে মাত্র দুজন। ঐসব লোকেরা ইতিমধ্যে ভালোবেসে ফেলেছিল আমাদের। একজন মুসলমান বৃদ্ধ আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করতে কেঁদেই ফেললেন। আবু তালেব আর হুন্দা তো এলোই সোনমার্গ পর্যন্ত।

সোনমার্গে এসে আমরা বাসের জন্য দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। বাসের আর পাত্তা নেই। বিকেল হয়ে এসেছে, এর পর আর বেশীক্ষণ বাস বা গাড়ি চলবেও না এ পথে। কাকাবাবু চেষ্টা করলেন কোনো জিপ ভাড়া করার জন্য। তাও পাওয়া গেল না। একটু বাদে একটা স্টেশন ওয়াগন হুস করে থামলো আমাদের সামনে। সামনের সীট থেকে দাড়িওয়ালা একটা মুখ বেরিয়ে এসে জিগ্যেস করলো, কী প্রোফেসারসাব, পহলগাম ফিরবেন নাকি?

সুচা সিং। আশ্চর্যের ব্যাপার আমরা যখনই কোনো জায়গায় যাবার চেষ্টা করি, ঠিক সুচা সিং-এর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। ওঁকে দেখে কাকাবাবু এই প্রথম একটু খুশী হলেন। নিজেই অনুরোধ করে বললেন, কী সিংজী, আমাদের একটু পহলগাম পৌঁছে দেবে নাকি? আমরা গাড়ি পাচ্ছি না।

সুচা সিং গাড়ি থেকে নেমে এসে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! আপনি আমার গাড়িতে চড়বেন এ তো আমার ভাগ্য! আসুন, আসুন! কী খোকাবাবু, গাল দুটো খুব লাল হয়েছে দেখছি। খুব আপেল খেয়েছো বুঝি?

কাকাবাবু বললেন, সিংজী, তোমার গাড়ির যা ভাড়া হয় তা আমি দেবো। তোমার ব্যবসা, আমরা এমনি-এমনি চড়তে চাই না।

সুচা সিং একগাল হেসে বললেন, আপনার সঙ্গেও ব্যবসার সম্পর্ক? আপনি একটা মানী গুণী লোক। তাছাড়া, আজ আমি শ্বশুরবাড়ী থেকে ফিরছি, আজ তো আমি ব্যবসা করতে আসিনি। আপনাকে বলেছিলাম না, আমি কাশ্মীরী মেয়ে বিয়ে করেছি? এইদিকেই বাড়ি—

গাড়িতে উঠে বসলাম। গাড়ির পেছনে নানান রকমের ফলের

ঝুড়িতে ভর্তি। সুচা সিং বোধহয় ওসব উপহার পেয়েছেন শ্বশুরবাড়ি থেকে। আমরা আমাদের জিনিসপত্র পেছনেই রাখলাম, কিন্তু সেই তামার বাক্সটা কাকাবাবু একটা কাঠের বাক্সে ভরে নিয়েছিলেন, সেটা কাকাবাবু খুব সাবধানে নিজের কাছে রাখলেন।

গাড়ি ছাড়ার পর সুচা সিং বললেন, প্রোফেসারসাব, আপনার এদিককার কাজ কর্ম হয়ে গেল? কিছু পেলেন?

কাকাবাবু উদাসীনভাবে উত্তর দিলেন, না, কিছু পাইনি। আমি এবার ফিরে যাবো।

—ফিরে যাবেন? এর মধ্যেই ফিরে যাবেন? আর কিছু দিন দেখুন!

—নাঃ, আমার দ্বারা এসব কাজ হবে না বুঝতে পারছি। তাছাড়া গন্ধকের খনি এখানে বোধহয় পাবার সম্ভাবনা নেই।

—ওসব গন্ধক-টন্ধক ছাড়ুন! আপনাকে আমি বলে দিচ্ছি, এখানকার মাটির নিচে সোনা আছে। মার্টন্-এর দিকে যদি খোঁজ করতে চান, বলুন, আমি আপনাকে সব রকম সাহায্য করবো।

—তুমি অন্য লোককে দিয়ে চেষ্টা করো সিংজী, আমাকে দিয়ে হবে না।

—কেন প্রোফেসারসাব, আপনি এত নিরাশ হচ্ছেন কেন? আপনাকে আমি লোকজন, গাড়ি-টাড়ি সব দেব—আপনি শুধু বাৎলাবেন!

—আমি বুড়ো হয়ে গেছি। পায়েও জোর নেই। আমি একটু খাটাখাটি করলেই ক্লান্ত হয়ে পড়ি, আমার দ্বারা কি ওসব হয়!

—আপনার ঐ বাক্সটার মধ্যে কী আছে?

কাকাবাবু তাড়াতাড়ি বাক্সটার গায়ে ভালো করে হাত চাপা দিয়ে বললেন, ও কিছু না, দু' একটা টুকিটাকি জিনিসপত্তর।

—কী আছে, বলুন না! আমি কি নিয়ে নিচ্ছি নাকি? হাঃ হাঃ—

আমি সুচা সিংকে নিরস্ত করবার জন্য বলে ফেললাম, ওর মধ্যে একটা পাথর আছে। আর কিছু নেই!

বলেই বুঝলাম ভুল করেছি। কাকাবাবু আমার দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকালেন। সুচা সিং ভুরু কুঁচকে বললেন, পাথর? একটা পাথর অত যত্ন করে নিয়ে যাচ্ছেন? সোনাটোনার স্যাম্পেল নাকি? সোনা তো পাথরের সঙ্গেই মিশে থাকে!

কাকাবাবু কথাটা হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে বললেন, আরে ধ্যাৎ, সেসব কিছু না। তুমি খালি সোনার স্বপ্ন দেখছো। এটা একটা কালো রঙের পাথর, দেখে ভালো লাগলো, তাই নিয়ে যাচ্ছি!

—আলাদা বাক্সে কালো পাথর? এদিকে কালো পাথর পাওয়া যায় বলে তো কখনো শুনিনি। প্রোফেসার, আমাকে একটু দেখাবেন?

—পরে দেখবে। এখন এটা খোলা যাবে না!

—কেন, খোলা যাবে না কেন? সামান্য একটা বাক্স খোলা যাবে না? দিন, আমি খুলে দিচ্ছি?

এক হাতে গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে সুচা সিং একটা হাত বাড়ালেন বাক্সটা নেবার জন্য।

কাকাবাবু বাক্সটা অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে বললেন, না এখন না। বলছি তো, এখন খোলা যাবে না!

সুচা সিং তবু হাত বাড়িয়ে হাসতে হাসতে বললেন, দিন না, একটু দেখি! পাথর নিয়ে যাচ্ছেন, না লুকিয়ে লুকিয়ে সোনার স্যাম্পেল নিয়ে যাচ্ছেন, সেটা একটু দেখবো না! ভয় নেই, ভাগ বসাবো না। শুধু দেখে একটু চক্ষু সার্থক করবো!

কাকাবাবু হঠাৎ রেগে গিয়ে বললেন, না, এ বাক্সে হাত দেবে না। বারণ করছি, শুনছো না কেন?

সুচা সিং কঠিন চোখে তাকালেন কাকাবাবুর দিকে। স্থির ভাবে। তাকিয়েই রইলেন দু' এক মিনিট। আমি বুঝতে পারলাম, ওঁর মনে আঘাত লেগেছে। কাকাবাবুর দিক থেকে মুখ ফেরালেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, প্রোফেসারসাব, আমার নাম সুচা সিং। আমাকে এ তল্লাটের অনেকে চেনে। আমাকে কেউ ধমক দিয়ে কথা বলে না।

কাকাবাবু তখনও রাগের সঙ্গে বললেন, আমি বারণ করলেও কেউ আমার জিনিসে হাত দেবে, সেটাও আমি পছন্দ করি না। তুমি আমার সঙ্গে চোখ রাঙিয়ে কথা বলো না!

সুচা সিং বাক্সটার দিকে একবার, কাকাবাবুর মুখের দিকে একবার তাকালেন। আমার ভয় হলো, সুচা সিং যে-রকম রেগে গেছেন, যদি এখানেই গাড়ি থেকে নেমে যেতে বলেন! এখনও যে অনেকটা রাস্তা বাকী!

সুচা সিং কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে বললেন, প্রোফেসারসাব, আপনি হঠাৎ এত রেগে গেলেন কেন? একটা সামান্য পাথরও আপনি আমায় দেখাতে চান না! ঠিক আছে, দেখাবেন

না। আমি কি আর জোর করে দেখবো? আমি আপনাকে কত ভক্তি শ্রদ্ধা করি! আপনার মতন মানী গুণী লোক তো বেশী দেখি না। সারাদিন ব্যবসার ধান্দায় থাকি, তবু আপনাদের মতন লোকের সঙ্গে দুটো কথা বললে ভালো লাগে। আপনি আমার ওপর রাগ করছেন!

কাকাবাবু তখনও রেগে আছেন, স্পষ্ট বোঝা যায়। তবু একটু স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে বললেন, কেউ কোনো কিছু একবার না বললে, তারপর আর সে নিয়ে জোর করতে নেই। তাহলেই রাগের কোনো কারণ ঘটে না।

—ঠিক আছে, আমার গোস্তাকি হয়েছে। আমাকে মাপ করে দিন। তা প্রোফেসারসাব, সোনমার্গ ছেড়ে দিলেন, এবার কি অন্য কোনো দিকে কাজ শুরু করবেন!

—না, আর কাজ-টাজ করার মন নেই। এবার কলকাতায় ফিরবো!

—সে কি, এত খাটাখাটি করে শেষ পর্যন্ত একটা পাথরের টুকরো নিয়ে ঘর যাবেন?

—ওটা একটা স্মৃতিচিহ্ন!

এরপর কিছুক্ষণ কেউ আর কোনো কথা বললো না। আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম, কাকাবাবুর রাগ এখনো কমেনি, কাকাবাবু এমনিতে শান্ত ধরনের মানুষ, কিন্তু একবার রেগে গেলে সহজে রাগ কমে না। ঐ বাক্সটা তিনি আর কারুকে ছুঁতে দিতেও চান না।

একটু বাদে সুচা সিং আবার বললেন, প্রোফেসারসাব, আপনার কোটের পকেট থেকে একটা রিভলবার উঁকি মারছে দেখলাম। সব সময় অস্ত্র নিয়ে ঘোরেন নাকি?

কাকাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, জন্তু-জানোয়ার কিংবা দুষ্ট লোকের তো অভাব নেই। তাই সাবধানে থাকতে হয়।

সুচা সিং হেসে হেসে বললেন, সে কথা ঠিক, সে কথা ঠিক!

পহলগামে এসে পৌঁছুলাম সন্ধের পর। নটা বেজে গেছে। গাড়ি থেকে নামবার পর সুচা সিং কাকাবাবুর দেওয়া টাকা কিছুতেই নিলেন না। বরং কাকাবাবুর করমর্দন করে বললেন, প্রোফেসারসাব, আমি আপনার দোস্ত। গোসা করবেন না। যাবার আগে দেখা করে যাবেন! খোকাবাবু, আবার দেখা হবে, কী বলো?

আমার মনে হলো, সুচা সিং মানুষটা তেমন খারাপ নয়। কাকা-বাবু ওর ওপর অমন রাগ না করলেই পারতেন।

পহলগামে লীদার নদীর ওপারে আমাদের তাঁবুটা রাখাই ছিল। যে রকম রেখে গিয়েছিলাম, জিনিসপত্তর ঠিক সেই রকমই আছে। সেখানে পৌঁছবার পর কাকাবাবু কাঠের বাক্সটা খুব সাবধানে তাঁর ট্রাঙ্কে ভরে রাখলেন। তারপর বললেন, সন্তু, তোমাকে আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, এটার কথা কারুকে বলবে না। আর এটাকে কিছুতেই চোখের আড়াল করবে না। আমি যখন তাঁবুতে থাকবো না, তুমি তখন সব সময় এটার সামনে বসে থাকবে। আর তুমি না থাকলে আমি পাহারা দেবো। বুঝলে?

আমি বললাম, কাকাবাবু, মুণ্ডুটা আমি তখন ভালো করে দেখিনি, আর একবার দেখবো এখন?

কাকাবাবু উঠে গিয়ে আগে তাঁবুর সব পর্দাটর্দা ফেলে দিলেন। অন্য সব আলো নিভিয়ে শুধু একটা আলো জেবলে রেখে তারপর ট্রাঙ্ক থেকে বার করলেন কাঠের বাক্সটা। কাঠের বাক্সটার মধ্যে সেই পুরোনো তামার বাক্স, সেটার গায়েও এক সময় কী যেন লেখা ছিল— এখন আর পড়া যায় না।

পরিষ্কার তোয়ালে দিয়ে কাকাবাবু কনিষ্কর মুখ মুছতে লাগলেন। এখন তার কপাল, চোখ, ঠোঁটের রেখা অনেক স্পষ্ট হয়ে উঠলো। ভাঙা নাক ও কান দুটো জোড়া দিলে সম্পূর্ণ মুখের আদল ফুটে উঠবে। কাকাবাবু কী স্নেহের সঙ্গে হাত বুলোচ্ছেন সেই পাথরের মূর্তিতে। আমার দিকে ফিরে আস্তে আস্তে বললেন, সন্তু, এটার আবিষ্কার হিসেবে তোর নামও ইতিহাসে লেখা থাকবে!

রাত্তিরে খাওয়াদাওয়া করে আমরা খুব সকাল-সকাল শুয়ে পড়লাম। আজ রাত্তিরে আর কাকাবাবু ঘুমের ঘোরে কথা বলেননি একবারও। আজ তিনি সত্যিকারের শান্তিতে ঘুমিয়েছেন।

ভোরবেলা কাকাবাবুই আমাকে ডেকে তুললেন। এর মধ্যেই ওঁর দাড়ি কামানো হয়ে গেছে। কাকাবাবু বললেন, লীদার নদীর জলে রোদ্দুর পড়ে কী সুন্দর দেখাচ্ছে, দ্যাখো! কাশ্মীর ছেড়ে চলে যেতে হবে বলে তোমার মন কেমন করছে, না?

—কাকাবাবু, আমরা কি আজই ফিরে যাবো?

—প্লেনে কবে জায়গা পাই সেটা দেখতে হবে। আজ জায়গা পেলে আজই যেতে রাজী। তুমি সব জিনিসপত্তর বাঁধাছাদা করে ঠিক করে রাখো।

বেলা বাড়ার পর কাকাবাবু বললেন, সন্তু, তুমি তাঁবুতে থাকো,

আমি সব খোঁজখবর নিয়ে আসি। ব্যাসাম সাহেব আর রতীন মুখার্জিকে দুটো টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে—ওরা কনিষ্ক সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। আমি না আসা পর্যন্ত তুমি কিন্তু কোথাও যাবে না।

কাকাবাবু চলে গেলেন। আমি খাটে শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়তে লাগলাম। একটা অ্যাডভেঞ্চারের গল্প। পড়তে পড়তে মনে হলো, আমরা নিজেরাও কম অ্যাডভেঞ্চার করিনি। গুহার মধ্যে হঠাৎ পড়ে যাওয়া, পাইথন সাপ—কলকাতায় আমার স্কুলের বন্ধুরা শুনলে বিশ্বাসই করতে চাইবে না। কিন্তু এত বড় একটা আবিষ্কারের কথা কাগজে নিশ্চয়ই বেরুবে। তখন তো সবাইকে বিশ্বাস করতেই হবে।

কাকাবাবু জিগেস করছিলেন, কাশ্মীর ছেড়ে যেতে আমার মন-কেমন করবে কি না! সত্যি কথা বলতে কি, আমার আর একটুও ভালো লাগছিল না থাকতে। যদিও শ্রীনগর দেখা হলো না, তাহলেও...। পৃথিবীর লোক কখন আমাদের আবিষ্কারের কথা জানবে, সেই উত্তেজনায় আমি ছটফট করছিলাম।

কতক্ষণ বই পড়েছিলাম জানি না। হোটেলের বেয়ারা যখন খাবার নিয়ে এলো তখন খেয়াল হলো। ওপারের হোটেল থেকে আমাদের তাঁবুতে খাবার নিয়ে আসে, কিন্তু কাকাবাবু তো এখনও এলেন না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম কাকাবাবুর জন্য। তারপর খিদেয় যখন পেট চুঁই চুঁই করতে লাগলো, তখন খেয়ে নিলাম নিজের খাবারটা। কাকাবাবুর খাবারটা ঢাকা দিয়ে রাখলাম।

বিকেল গড়িয়ে গেল, তখনও কাকাবাবু এলেন না। দুশ্চিন্তা হতে লাগলো খুব। কাশ্মীরে এসে কাকাবাবু কক্ষনো একলা বেরোননি। সব সময় আমি সঙ্গে থেকেছি। কিন্তু এখন যে একজনকে তাঁবুতে পাহারা দিতে হবে! এত দেরী করার তো কোনো মানে হয় না। ছোট্ট জায়গা, পোস্ট অফিসে লাইন দিতেও হয় না কলকাতার মতন। কাকাবাবুর কোনো অ্যাকসিডেন্ট হয়নি তো? হঠাৎ জরুরী কাজে কারুর সঙ্গে দেখা করার জন্য কোথাও চলে যেতে হয়েছে? কিন্তু তাহলে কি আমায় খবর দিয়ে যেতেন না? কাকাবাবু তাঁবু থেকে বেরুতে বারণ করেছেন, আমি খোঁজ নিতে যেতেও পারছি না।

বিকেল থেকে সন্ধে, সন্ধে থেকে রাত নেমে এলো। কাকাবাবুর দেখা নেই। এতক্ষণ একা-একা এই তাঁবুতে থেকে আমার কান্না পাচ্ছিল। কিছুই করার নেই, কারুর সঙ্গে কথা বলার নেই। কী যে

খারাপ লাগে! আমার বয়েসী কোনো ছেলে কি কখনো এতটা সময় একলা থাকে? সেই সকাল থেকে—এখন রাত সাড়ে ন'টা। মনে হচ্ছিল, তাঁবুর মধ্যে আমায় যেন কেউ বন্দী করে রেখেছে! কাকাবাবুর কাছে কথা দিয়েছি যে মুণ্ডুটাকে ফেলে রেখে আমি কোথাও যাবো না—তাই বেরুনোর উপায় নেই। যদিও, আমাদের কাছে যে এই মহামূল্যবান জিনিসটা আছে সে কথা কেউ জানে না—তবু কাকাবাবুর হুকুম, সব সময় ওটা চোখে চোখে রাখা। এখন আমি কী করবো কে আমায় বলে দেবে?

রাত নিঝুম হবার পর আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। এর আগে কোনোদিন আমি একলা কোথাও ঘুমোইনি। আমার ভয় করে। কিছুতেই ঘুম আসে না। খালি মনে হয়, কারা যেন ফিসফিস করে কথা বলছে। কাদের যেন পায়ের দুপদাপ শব্দ শোনা যাচ্ছে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না, হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলেই দেখলাম, আমার মাথার কাছে একটা বিরাট লম্বা লোক দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমে মনে হলো চোখের ভুল। একবার চোখ বন্ধ করে আর একবার তাকাতেই দেখলাম তখনো দাঁড়িয়ে আছে লোকটি। প্রথমে মনে হলো, ইতিহাসের আমল থেকে বোধ হয় কোনো আত্মা এসেছে প্রতিশোধ নিতে। তারপরই বুঝলাম, তা নয়, আমি চিৎকার করে ওঠবার আগেই মস্ত বড় একটা হাত আমার মুখ চেপে ধরলো। আমি সে হাতটা প্রাণপণ চেষ্টা করেও ছাড়াতে পারলাম না। তাকিয়ে দেখলাম, তাঁবুর মধ্যে আরও দুজন লোক আছে। তাদের একজন আমার মুখের মধ্যে খানিকটা কাপড় ভরে দিয়ে মুখটা বেঁধে দিল। হাত আর পা দুটোও বাঁধলো। তারপর তারা তাঁবুর সব জিনিসপত্তর লণ্ডভণ্ড করতে লাগলো। একটু বাদেই তারা দুদ্দাড় করে বেরিয়ে গেল তাঁবু থেকে।

ঘটনাটা ঘটতে দু' তিন মিনিটের বেশী সময় লাগলো না। আমার মুখ বন্ধ, হাত পা বাঁধা, কিন্তু দেখতে পেলাম সবই। কারণ ওরা মাঝে মাঝে টর্চ জ্বালাচ্ছিল। তাঁবুর সব জিনিস ওরা ওলোট পালোট করে গেল, কিন্তু ওরা একটা জিনিসই খুঁজতে এসেছিল।

এতদিন আমাদের তাঁবুটা এমনি পড়েছিল, কেউ কোনো জিনিস নেয়নি। আজ ডাকাতি হয়ে গেল। তবে, ওদের মধ্যে একজনকে আমি চিনতে পেরেছি। অন্ধকারে মুখ দেখা না গেলেও যে-হাতটা আমার মুখ চেপে ধরেছিল, সেই হাতটার একটা আঙুল কাটা ছিল।

সুচা সিং-এর একটা আঙুল নেই।

ওরা চলে যাবার পরও কিছুক্ষণ আমি চুপ করে শুয়ে রইলাম। যতক্ষণ ওরা তাঁবুতে ছিল, ততক্ষণ খালি মনে হচ্ছিল ওরা যাবার সময় আমাকে মেরে ফেলবে।

বেশ খানিকটা পর আমি আস্তে আস্তে উঠে বসলাম। হাত বাঁধা, চ্যাঁচাবারও উপায় নেই। কিন্তু এই অবস্থায় তো সারারাত কাটানো যায় না।

আস্তে আস্তে নামলাম খাট থেকে। জোড়া পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে এগোবার চেষ্টা করলাম। দুবার পড়ে গেলাম হুমড়ি খেয়ে, তবু এগুনো যায়। ইস্কুলের স্পোর্টসে স্যাক রেস-এ দৌড়েছিলাম আমি, অনেকটা সেই রকম, কিন্তু বুক এমন কাঁপছে যে ব্যালেন্স রাখতে পারছি না।

কোনো রকমে পৌঁছুলাম টেবিলের কাছে। ড্রয়ার খুলে বার করলাম ছুরিটা। কিন্তু ছুরিটা ঠিক মতন ধরা যাচ্ছে না কিছুতেই। অতি কষ্টে ছুরিটা বেঁকিয়ে ঘষতে লাগলাম হাতের দড়ির বাঁধনে। প্রথমে মনে হলো, এটা একটা অসম্ভব কাজ। এ ভাবে সারা রাত ঘষেও দড়ি কাটা যাবে না—কারণ আঙুলে জোর পাচ্ছি না। শীতে আমি বাঁশ পাতার মতন কাঁপছি। কিন্তু বিপদের সময় মানুষের এমন মনের জোর এসে যায় যে অসম্ভবও সম্ভব হয় অনেক সময়। একবার ছুরিটা পড়ে গেল মাটিতে। সেটা তুলতে গিয়ে আমি নিজেও পড়ে গেলাম—একটুর জন্য আমার গালটা কাটেনি। সেই অবস্থায়, মাটিতে শুয়ে শুয়েই আমার মনে হলো, ঘাবড়ালে কোনো লাভ নেই, কান্নাকাটি করলেও কোনো ফল হবে না—আমাকে উঠে দাঁড়াতেই হবে, কাটতেই হবে হাতের বাঁধন। ছুরিটা নিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম। প্রায় আধ ঘণ্টা লাগলো কাটতে, ততক্ষণে আমার হাত দুটো প্রায় অসাড় হয়ে এসেছে। মুখ ও পায়ের বাঁধন খুলে ফেললাম। এঃ, আমার মুখের মধ্যে এমন একটা ময়লা রুমাল ভরে দিয়েছিল যে দেখেই আমার বমি পেয়ে গেল, বমি করে ফেললাম মাটিতে। এই সময় বমি করার কোনো মানে হয়? কিন্তু রুমালটায় এমন বিশ্রী গন্ধ যে কিছুতেই সামলানো গেল না। ফ্লাস্কের গরম জলে মুখ ধুয়ে ফেললাম। তাও, ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলাম শীতে।

তাঁবুর মধ্যে এক নজর তাকিয়েই বোঝা যায়, ওরা সেই কাঠের

বাক্সটা নিয়ে গেছে। পাথরের মুণ্ডুটার কোনো মূল্যই ওদের কাছে নেই—তবু কেন নিলে গেল? হয়তো ওরা নষ্ট করে ফেলবে। ওরা কি কাকাবাবুকে মেরে ফেলেছে? ওরা কি আমাকেও মারবে?

ডাকাতের বউ আর ছেলেমেয়ে

বিপদের রাত্রি অনেক দেরী করে শেষ হয়। সারা রাত কম্বল মুড়ি দিয়ে খাটের ওপর বসেছিলাম। চোখ় ঢুলে আসছিল, তবু ঘুমোইনি। আস্তে আস্তে যখন সকাল হলো, তখন মনের মধ্যে একটু জোর পেলাম। দিনের আলোয় অনেকটা সাহস আসে। মনে মনে ঠিক করলাম, ভয় পেয়ে কান্নাকাটি করে কোনো লাভ নেই। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে, কাকাবাবুকে খুঁজে বার করতে হবে।

কিন্তু আমি একলা একলা কী করবো? কেউ কি আমার কথা বিশ্বাস করবে? বাচ্চা ছেলে বলে হয়তো আমার কথা উড়িয়ে দেবে। কাকাবাবুর মতন একজন বয়স্ক জলজ্যান্ত লোক হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। নিশ্চয়ই সুচা সিং-এর হাত আছে তাতে। কাকাবাবু থাকতে থাকতে মূর্তিটা নিতে সাহস করেনি। কাকাবাবুর সঙ্গে রিভলবার থাকে। তাই কাকাবাবুকে আগে সরিয়ে তারপর জিনিসটা নিয়ে যাওয়া হলো! সুচা সিং-এর অনেক প্রভাব প্রতিপত্তি, ও'র বিরুদ্ধে আমার কথা কে শুনবে?

আমাদের পাশের তাঁবুতে কয়েকজন জার্মান ছেলেমেয়ে থাকে। একটু একটু আলাপ হয়েছিল। ওদেরও বলে কোনো লাভ নেই, ওরা বিদেশী, কী আর সাহায্য করতে পারবে? চট করে মনে পড়ে গেল সিদ্ধার্থদার কথা। সিদ্ধার্থদা, স্নিগ্ধাদি, রিণি—ওরা কি অমরনাথ থেকে ফিরেছে? হয়তো এর মধ্যেই ফিরে শ্রীনগর চলে গেছে। এর মধ্যে ক'দিন কেটে গেল—অমরনাথ থেকে ফিরতে ক'দিন লাগে—সেটা আর কিছুতেই হিসেব করতে পারছি না। খালি মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, অমরনাথ থেকে ফিরলে নিশ্চয়ই প্লাজা হোটেলে উঠবে, সেখানে খবর পাওয়া যাবে।

কাকাবাবু বলেছিলেন, কোনোক্রমেই তাঁবু থেকে না বেরুতে। কিন্তু যে-জন্য বলেছিলেন, তার তো আর কোনো দরকার নেই। আসল জিনিসটাই চুরি হয়ে গেছে। আমাদের তাঁবুতে আর দামী জিনিস বিশেষ কিছু নেই। কাকাবাবু টাকা পয়সা কোথায় রাখতেন আমি

জানি না—সেগুলোও বোধহয় ডাকাতরা নিয়ে গেছে। হোটেলের বিল কী করে শোধ হবে কে জানে! সিদ্ধার্থদাদের না পেলে চলবেই না।

হেঁটে হেঁটে গেলাম প্লাজা হোটেলে। সেখানে কোনো খবরই পাওয়া গেল না। সিদ্ধার্থদারা হোটেল ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন অমরনাথে—ফিরে এসেছেন কিনা ওঁরা জানেন না। ফেরার পর রিজার্ভেশনও করা নেই। এর মধ্যে ফিরে এসে অন্য হোটেলেও উঠতে পারেন বা শ্রীনগরে চলে যেতে পারেন। আবার এখনও ফিরতে নাও পারেন, অর্থাৎ আমি কিছুই জানতে পারলাম না। তবে, পোপোটলাল নামে একজন পাণ্ডা গিয়েছিলেন ওঁদের সঙ্গে—তার খোঁজ পেলে সব জানা যেতে পারে। পাণ্ডাজী যদি ফিরে থাকেন, তবে তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া যাবে সব খবরাখবর। পোপোটলালের ঠিকানা? ঠিকানা কিছু নেই—বাজারের কাছে গিয়ে খোঁজ করলে লোকে বলে দেবে।

নিরাশ হয়ে ফিরে এলাম প্লাজা হোটেল থেকে। কোথায় এখন পোপোটলালকে পাবো? মানুষ হারিয়ে গেলে পুলিশকে খবর দিতে হয় শুনেছি। কাকাবাবুর কথা পুলিশকে জানাতে হবে।

পহলগামের রাস্তা দিয়ে এখন কত মানুষজন হাঁটছে, কত আনন্দ সবার মুখে চোখে। আমার বিপদের কথা কেউ জানে না। আমাকে কেউ ডেকে জিজ্ঞেস করলো না, খোকা, তোমার মুখটা এমন শুকনো দেখছি কেন? তোমার কি কিছু হয়েছে? আমারই বয়েসী কত ছেলে-মেয়ে হৈ চৈ করতে করতে যাচ্ছে বেড়াতে। আমার কেউ চেনা নেই। কলকাতায় বাবাকে টেলিগ্রাম করবো? বাবা আসতে আসতে যে সময় লাগবে ততদিন আমি একা...

হাঁটতে হাঁটতে বাস ডিপোর দিকে চলে এসেছিলাম। দু' একটা দোকানে জিজ্ঞেস করেছি পোপোটলালের খবর। কেউ কিছু বলতে পারেনি। এখন খুব টুরিস্ট আসার সময়—দোকানদাররা খদ্দের সামলাতেই ব্যস্ত—আমার কথা ভালো করে শোনার পর্যন্ত সময় নেই। হঠাৎ দেখলাম একটা বাসের জানলায় রিণির মুখ। এক্ষুনি বোধহয় বাসটা ছেড়ে দেবে। আমি প্রাণপণে দৌড়োতে লাগলাম, হাত পা ছুঁড়ে ডাকতে লাগলাম, রিণি, রিণি!

বাসটা ছাড়েনি। রিণি আর স্নিগ্ধাদি বসে আছে। হাঁপাতে হাঁপাতে জিগ্যেস করলাম, সিদ্ধার্থদা কোথায়?

স্নিগ্ধাদি বললেন, ও আসছে এক্ষুনি। তুই ওরকম করছিস কেন রে, সন্তু?

রিণি বললো, কাল সারাদিন তোকে খুঁজলাম। কোথাও পেলাম না। ভাবলাম তোরা চলে গেছিস। আমরা পরশু ফিরেছি অমরনাথ থেকে। এবার পহলগ্রামে আমরাও তাঁবুতে ছিলাম।

কাল সারাদিন আমি তাঁবুতে বসে ছিলাম, আর ওদিকে ওরা আমাকে খুঁজছে। লীদার নদীর ধারে প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটা তাঁবু—হয়তো আমাদেরটার কাছাকাছিই ওরা ছিল, আমি টের পাইনি। এর কোনো মানে হয়?

একটু দম নিয়ে আমি বললাম, সিদ্ধার্থদাকে আমার ভীষণ দরকার। এক্ষুনি। স্নিগ্ধাদি, তোমাদের এই বাসে যাওয়া হবে না। নেমে পড়ো, শিগগির নেমে পড়ো।

স্নিগ্ধাদি উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন, কী হয়েছে কি? আমাদের তো বাসের টিকিট কাটা হয়ে গেছে, মালপত্র তোলা হয়ে গেছে।

আমি বললাম, তোমরা আগে নেমে পড়ো, তারপর সব কথা বলছি! সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হয়ে গেছে। কাকাবাবু হারিয়ে গেছেন। আমাদের তাঁবুতে...

রিণি হি-হি করে হেসে উঠে বললো, কাকাবাবু হারিয়ে গেছেন? অতবড় একটা লোক আবার হারিয়ে যায় নাকি? বল্, তুই-ই হারিয়ে গেছিস, তোর কাকাবাবুই তোকে খুঁজছেন।

আঃ, মেয়েদের নিয়ে আর পারা যায় না। রিণিটা একদম বাজে মার্কা। দরকারী কথার সময়েও হাসে। ভাগ্যিস এই সময় সিদ্ধার্থদা এসে গেলেন।

আমি সিদ্ধার্থদাকে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে যত সংক্ষেপে সম্ভব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম। সিদ্ধার্থদা ভুরু কুঁচকে একটুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, এ তো সত্যি সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। আমাদের সব মালপত্র উঠে গেছে, শ্রীনগরে লোক অপেক্ষা করবে। অথচ তোমাকে একা ফেলে রাখাও যায় না। কি করা যায় বলো তো? এক্ষুনি ঠিক করতে হবে, দেরি করার সময় নেই! আচ্ছা, এক কাজ করা যাক।

ততক্ষণে বাসটা স্টার্ট নিয়েছে, কণ্ডাকটর হুইসল বাজাচ্ছে ঘন ঘন। এ সব জায়গায় বাসে নিয়মকানুন খুব কড়া। সিদ্ধার্থদা জানলার কাছে গিয়ে স্নিগ্ধাদিকে বললেন, শোনো, তোমরা দুজনে চলে যাও শ্রীনগরে। এখানে একটা ব্যাপার হয়ে গেছে—আমি সন্তুর

সঙ্গে থাকছি—একদিন পর যাবো।

স্নিগ্ধাদি তো কথাটা শুনেই উঠে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, পাগল নাকি! আমরাও থাকবো তাহলে। কন্ডাকটরকে বলো—

সিদ্ধার্থদা বললেন, লক্ষ্মীটি, আমার কথা শোনো। শ্রীনগরে তো সব ঠিক করাই আছে, তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। তোমরা এখানে থাকলেই বরং অসুবিধা হবে। আমি একদিন পরেই আসছি।

বাস ততক্ষণে চলতে শুরু করেছে, সিদ্ধার্থদা সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা হেঁটে গেলেন বোঝাতে বোঝাতে। স্নিগ্ধাদি আমাকে ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, কি হয়েছে বল তো সন্তু? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না! এই সন্তু, তুই চুপ করে আছিস কেন?

কিন্তু আমি কিছুই বলতে পারলাম না ঐটুকু সময়ে—সিদ্ধার্থদা বললেন, যা হয়েছে পরে শুনতে পাবে। চিন্তা করো না, আমি কালকেই যাচ্ছি!

তারপর বাস জোরে ছুটলো, রিণি হাত নাড়তে লাগলো।

সিদ্ধার্থদা যে প্রথম থেকেই আমার কথায় গুরুত্ব দিলেন, বেশী কিছু জিগ্যেস না করেই থেকে যাওয়া ঠিক করলেন, সে জন্য সিদ্ধার্থদার কাছে আমি সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো। সময় এত কম ছিল—ওর মধ্যে কি সব বুঝিয়ে বলা যায়?

বাসটা চলে যাবার পর সিদ্ধার্থদা বললেন, চলো, কাজ শুরু করা যাক! তোমার কাকাবাবু কাল সকাল বেলা তাঁবু থেকে বেরিয়ে আর ফেরেননি? তোমাকে কোনো খবর না দিয়ে তিনি কোথাও চলে যাবেন, তা হতেই পারে না!

আমি জোর দিয়ে বললাম, তা হতেই পারে না!

—হুঁ! একটা জলজ্যান্ত লোক তা হলে যাবেই বা কোথায়!

—সুচা সিং...

—সুচা সিং? সে আবার কে?

—সুচা সিং নামের একজন লোকের সঙ্গে কাকাবাবুর ঝগড়া হয়েছিল। সেই লোকটাই তাঁবুর মধ্যে রাত্তিরবেলা আমাকে...

সিদ্ধার্থদা ভুরু কুঁচকে সব শুনলেন। চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। আমার মনের ভেতরের ভয়ের ভাবটা অনেকটা কেটে গেছে। সিদ্ধার্থদাকে যখন পেয়েছি, তখন একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই। যতক্ষণ একা ছিলাম, ততক্ষণ কি যে অসহ্য একটা অবস্থা...।

সিদ্ধার্থদা জিগ্যেস করলেন, থানায় খবর দিয়েছো? দাওনি? চলো, আগে সেখানেই যাই।

থানায় দুজন অফিসার ছিলেন, তাঁদের নাম মীর্জা আলি আর গুরুবচন সিং। খাতির করে বসতে বললেন আমাদের, মনোযোগ দিয়ে সব কথা শুনলেন। তারপর মীর্জা আলি বললেন, বহুৎ তাজ্জবকী বাৎ! এখানে এরকম ঘটনা কখনো ঘটে না। দিনের বেলা একটা লোক উধাও হয়ে যাবে কী করে? তাছাড়া সুচা সিং-এর নামে তো কেউ কোনোদিন কোনো অভিযোগ করেনি।

গুরুবচন সিং বললেন, আপনাদের তাঁবু থেকে কী কী চুরি গেছে? দামী জিনিস কী কী ছিল?

আমি আমতা আমতা করে বললাম, কাকাবাবুর একটা রিভলবার ছিল, সেটা তিনি নিয়ে বেরিয়েছিলেন কিনা জানি না—সেটা পাচ্ছি না। আর কিছু টাকা পয়সা—

—কত?

—আমি তা জানি না।

—ক্যামেরা-ট্যামেরা?

—ছিল না। একটা দূরবীন ছিল, সেটা নেয়নি।

—আশ্চর্য, এর জন্যই দিনের বেলায় একটা লোককে...রাত্তির বেলা তাঁবুতে ঢুকে...এখানে এ রকম কাণ্ড...ঠিক আছে, চলুন এনকোয়ারি করে দেখা যাক—

পোস্ট অফিসে গিয়ে জানা গেল, কাকাবাবু সেখানে টেলিগ্রাম করতে যাননি। আগের দিন মাত্র তিনজন টেলিগ্রাম করতে এসেছিল, তার মধ্যে কাকাবাবুর মতন চেহারার কেউ ছিল না। দু'জনই তাদের মধ্যে মহিলা, আর একজন স্থানীয় লোক। অর্থাৎ, যা হবার তা এখানে আসবার আগেই হয়েছে। আমাদের তাঁবুতে তদন্ত করে পুলিশ বুঝতে পারলেন, সেখানে ঢুকে লণ্ডভণ্ড করা হয়েছে, কিন্তু অপরাধীর কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না। সাধারণ চোর ডাকাত যে নয়, তা সহজেই বোঝা যায়। বাইনোকুলার, অ্যালার্ম ঘড়ি, পেন—এসব কিছুই নেয়নি। যে-ট্রাঙ্কটা চোররা ভেঙেছে, সেটার মধ্যেই একটা মানি ব্যাগ ছিল কাকাবাবুর, সেটাও চোরদের চোখে পড়েনি। সুচা সিং-এর গ্যারেজে গিয়ে শোনা গেল, সুচা সিং বিশেষ কাজে মাটন্ গেছে, বিকেলেই ফিরবে। মীর্জা আলি হুকুম দিলেন সুচা সিং ফিরলেই যেন থানায় গিয়ে দেখা করে।

কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর গুরুবচ্চন সিং বললেন, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনাদের কাকাবাবুকে নিশ্চয়ই খুঁজে বার করবো। মিঃ রায়চৌধুরীর সঙ্গে আমারও আলাপ হয়েছিল, খুব ভালো লোক—আমাদের সরকারের অনেকের সঙ্গে তাঁর চেনা জানা আছে, পহলগামে তাঁর কোনো বিপদ হবে, এতে পহলগামের বদনাম। সুচা সিং যদি দোষী হয়, তা হলে আমাদের হাত সে কিছুতেই এড়াতে পারবে না। শাস্তি পাবেই। আপনারা বিকেলে আবার খবর নেবেন। আমরা সব জায়গায় পুলিশকে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি।

পুলিশদের কাছ থেকে বিদায় নেবার পর সিদ্ধার্থদা আমাকে জিগ্যেস করলেন, সন্তু, সকাল থেকে কিছু খেয়েছো? মুখ তো একেবারে শুকিয়ে গেছে। অত চিন্তা করো না!

এতক্ষণ খাওয়ার কথা মনেই পড়েনি। সিদ্ধার্থদার কথা শুনেই বুঝতে পারলাম, কী দারুণ খিদে পেয়েছে! সেই মিষ্টির দোকানটায় ঢুকলাম। কাকাবাবুর সঙ্গে বাইরে যাবার সময় আমরা প্রত্যেকবার এখানে জিলিপি খেতাম। কাকাবাবু আজ নেই! কাকাবাবু কোথায় আছেন, কে জানে! আমার বুকের মধ্যে মুচড়ে উঠলো।

আমি সিদ্ধার্থদার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। কাকাবাবু বলেছিলেন, পাথরের মুণ্ডুটার কথা আমি যেন কোনো কারণেই কারুকে না বলি। সেইজন্য পুলিশকে বলিনি। কিন্তু সিদ্ধার্থদাকেও কি বলা যাবে না? সিদ্ধার্থদা তো আমাদের নিজেদের লোক। সিদ্ধার্থদার সাহায্য ছাড়া আমি একা কী করতে পারতাম? তাছাড়া সিদ্ধার্থদা ইতিহাসের অধ্যাপক, উনি ঠিক মূল্য বুঝবেন।

আমি আস্তে আস্তে বললাম, সিদ্ধার্থদা, পুলিশকে সব কথা আমি বলিনি। আমাদের একটা দারুণ দামী জিনিস চুরি গেছে।—

—কী?

—আমরা সম্রাট কনিষ্ক-র মুণ্ডু আবিষ্কার করেছিলাম।

—কী বললে? কার মুণ্ডু?

আস্তে আস্তে সব ঘটনা খুলে বললাম সিদ্ধার্থদাকে। সিদ্ধার্থদা অবাক বিস্ময়ে শুনলেন সবটা। তারপর ছটফট করতে লাগলেন। বললেন, কী বলছো তুমি, সন্তু! এ যে একেবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার। ইতিহাসের দিক থেকে এর মূল্য যে কী দারুণ তা বলে বোঝানো যাবে না। কিন্তু সেটা এরকম ভাবে নষ্ট হয়ে যাবে? অসম্ভব! যে-কোনো উপায়েই হোক, ওটা বাঁচাতেই হবে।

দোকানের বিল মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এসে সিদ্ধার্থদা আবার বললেন, তুমি ঠিক জানো, রাত্তিরবেলা সুচা সিং-ই ঢুকেছিল? সে-ই ওটা নিয়ে গেছে?

আমি জোর দিয়ে বললাম, আঙুল কাটা দেখেই আমি চিনেছি। তাছাড়া, ওটার কথা আর কেউ জানে না। সুচা সিংও জানতো না—ও কাঠের বাক্সটা খুলে দেখতে চেয়েছিল, ওর ধারণা ওর মধ্যে দামী কিছু জিনিস আছে।

—সুচা সিং ঐ একটা পাথরের মুখ নিয়ে কী করবে? ইতিহাস না জানলে, ওটার তো কোনো দামই নেই। সুচা সিং ওর মূল্য কী বুঝবে? সে নিতে চাইবেই বা কেন?

—সেটা আমিও জানি না। কিন্তু সিদ্ধার্থদা, ওর সব সময় ধারণা, কাকাবাবু এখানে সোনার খোঁজ করতে এসেছেন। ওর সেই সোনার জন্য লোভ।

কিন্তু যখন বাক্সটা নিয়ে দেখবে, ওতে দামী কিছু নেই, সোনা তো নেই-ই, তখন নিশ্চয়ই কাকাবাবুকে ছেড়ে দেবে। শুধু শুধু তো কেউ কোনো মানুষকে মারে না বা আটকে রাখে না।

—কাকাবাবু বলছিলেন, বিদেশের মিউজিয়ামগুলো জানতে পারলে নাকি ওটার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা দাম দিতে চাইবে।

—তার আগে তো জানতে হবে, মুণ্ডুটা কার! সেটা সুচা সিং জানবে কি করে? সুচা সিংকে সে কথা জানাও নি তো?

—না। সেইজন্যই বোধহয় কাকাবাবুকে আটকে রেখেছে।

—কাকাবাবু নিশ্চয়ই বলে দেবেন না!

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সিদ্ধার্থদা আপনমনেই বললেন, শুধু পুলিশের ওপর নির্ভর করলেই হবে না। আমাদেরও খোঁজ করতে হবে। ঐ পাথরের মুণ্ডুটার মূল্য পুলিশও বুঝবে না। ওটাকে রক্ষা করতে না পারলে...সন্তু, তুমি কিছুক্ষণ একলা থাকতে পারবে? আমি একটু দেখে আসি—

—না, সিদ্ধার্থদা, আমিও আপনার সঙ্গে যাবো। একলা থাকতে আমার ভয় করবে।

—দিনের বেলা আবার ভয় কি?

—না, আমি আপনার সঙ্গে যাবো। আচ্ছা, সিদ্ধার্থদা, এমন হতে পারে না যে সুচা সিং আসলে নিজের বাড়িতেই লুকিয়ে আছে। পুলিশকে ওর লোকরা মিথ্যে কথা বলেছে?

—তা মনে হয় না। পুলিশ তো যে-কোনো মুহূর্তেই সার্চ করতে পারে। তবু একবার গিয়ে দেখা যাক।

দু-একটা দোকানদারকে জিগ্যেস করতেই সুচা সিং-এর বাড়িটা জানা গেল। বেশ বড় দোতলা বাড়ি, সামনে একটা ছোট্ট বাগান। বাগানে একজন মহিলা কাজ করছিলেন। কাশ্মীরী মেয়ে—কী সরল আর শান্ত তাঁর মুখখানা। দুটি ফুটফুটে বাচ্চা ছেলেমেয়ে খেলা করছে। মহিলা বোধহয় সুচা সিং-এর স্ত্রী। সুচা সিং-এর কাশ্মীরী বউ সেকথা শুনেছিলেন। বাড়িটা দেখলে মনে হয় না—এটা কোনো বদমাইস লোকের বাড়ি।

সিদ্ধার্থ বাগানের গেটের সামনে গিয়ে খুব বিনীত ভাবে বললেন, বহিনজী, শুনিয়ে!

মহিলা একবার চোখ তুলে তাকালেন আমাদের দিকে। কোনো উত্তর দিলেন না!

সিদ্ধার্থদা আবার ডাকলেন, বহিনজী একটা বাত শুনিয়ে!

মহিলাটি এবারও কোনো উত্তর দিলেন না, আমাদের দিকে তাকালেন না। বুঝতে পারলুম, বাইরের কোনো লোকের সংগে কথা বলতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে ওঁকে। বাচ্চা ছেলে দুটি জুল-জুল করে তাকাচ্ছে আমাদের দিকে।

সিদ্ধার্থদা কিন্তু হাল ছাড়লেন না। এবার গলার আওয়াজ খুব করুণ করে বললেন, বহিনজী, এক গেলাস পানি পিলায়েংগে? বহুৎ পিয়াস লাগা! জল খেতে চাইলে কেউ কোনোদিন না বলতে পারে না। বিশেষত মেয়েরা। মহিলা এবার আমাদের দিকে তাকালেন। বাড়ির ভেতর গিয়ে এক গেলাস জল এনে নিঃশব্দে এগিয়ে দিলেন সিদ্ধার্থদার দিকে।

সিদ্ধার্থদা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, হামকো নেই, এই লেড়কাকো দীজিয়ে!

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, নে খেয়ে নে! মাথা ঘোরা কমেছে!

আমি তো অবাক! তবু কোনো কথা বললাম না। সেই ঠান্ডার মধ্যেই বাধ্য হয়ে এক গেলাস জল খেয়ে নিতে হলো। সিদ্ধার্থদা সুচা সিং-এর বৌকে বললেন, এই ছেলেটার মাথা ঘুরছে। এর খুব শরীর খারাপ লাগছে হঠাৎ। কি করি বলুন তো? মাথায় জল ঢেলে দেবো?
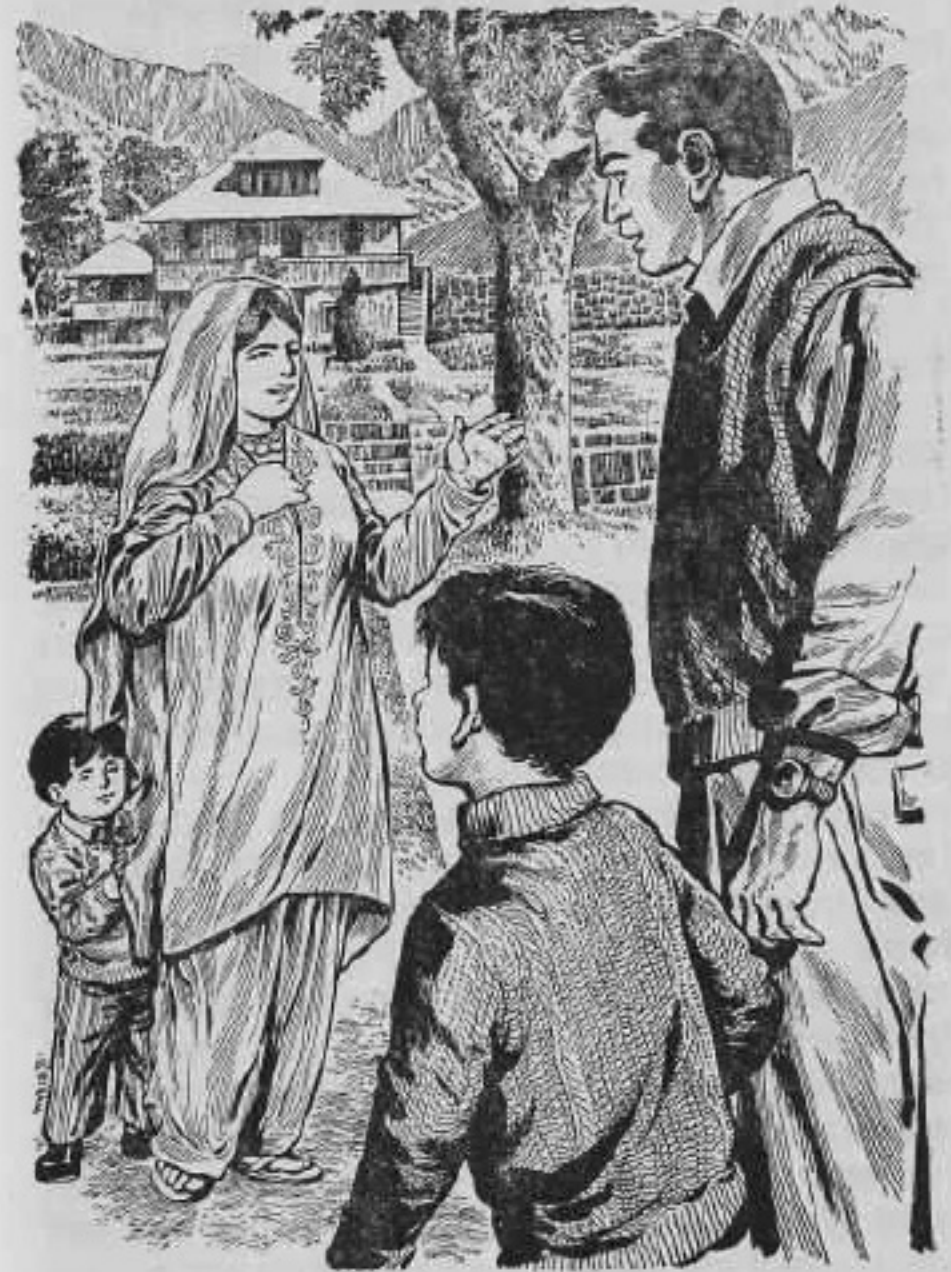
খুব দূরে নয়। দেওগির গাঁয়ে আমাদের একটা বাড়ি আছে, সেখানে গেলেন কাল। কবে ফিরবেন সে কথা তো কিছু বলেননি।

সুচা সিং-এর স্ত্রীর দয়া হলো। বাগানে একটা কাঠের বেঞ্চি ছিল, সেটা দেখিয়ে বললেন, ওর ওপর শুইয়ে দিন! সিদ্ধার্থদা আমাকে জোর করে শুইয়ে দিয়ে রুমাল দিয়ে হাওয়া করতে করতে বললেন, আজই শ্রীনগরে গিয়ে একে বড় ডাক্তার দেখাতে হবে। সুচা সিং যদি একটা গাড়ি দেন...

মহিলা বললেন, না, উনি বাড়ি নেই। গাড়ি ভাড়া নিতে হলে আপনারা গ্যারেজে গিয়ে দেখতে পারেন।

—গ্যারেজে খালি গাড়ি নেই। একটা মাত্র আছে—কিন্তু সিংজীর হুকুম ছাড়া সেটা পাওয়া যাবে না।

—কিন্তু উনি তো পহলগামে নেই এখন!

সিদ্ধার্থদা মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, আমাদের খুব দরকার ছিল। সিংজী কবে ফিরবেন? আজ ফেরার কোনো চান্স নেই? খুব দূরে কোথাও গেছেন কি?

—খুব দূরে নয়। দেওগির গাঁয়ে আমাদের একটা বাড়ি আছে, সেখানে গেলেন কাল। কবে ফিরবেন সে কথা তো কিছু বলেননি।

—দেওগির গ্রামটা কোথায় যেন? মার্টন-এর কাছেই না?

—না, ওদিকে তো নয়। সোনমার্গের রাস্তায়। লীদার নদী ছাড়িয়ে বাঁ দিকে গেলেই।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, নাম শুনেছি। দেওগির তো খুব সুন্দর জায়গা! সিদ্ধার্থদা রীতিমত গল্প জমিয়ে নিলেন। ছেলেমেয়ে দুটো আমাদের কাছে এসে বড় বড় টানা টানা চোখ মেলে তাকিয়ে রইলো আমাদের দিকে।

আমার মনে হলো, মানুষের লোভ জিনিসটা কী বিচ্ছিরি! সুচা সিং-এর এই তো এত সুন্দর বাড়ি, আট-ন' খানা গাড়ি ব্যবসায় খাটছে—তবু সোনার জন্য কী লোভ! সোনার লোভেই কাকাবাবুকে আটকে রেখেছে কোথাও। কাল রাত্তিরে আমাদের তাঁবুতে চুরি করতে গিয়েছিল। পুলিশ যখন ওকে ধরে ফাঁসি দেবে, তখন ছেলেমেয়ে-গুলো কাঁদবে কী রকম! শুনেছি আগেকার দিনে কাশ্মীরে কেউ চুরি করলে তার নাক বা কান বা হাত কেটে দিত।

একটু বাদে আমরা সুচা সিং-এর স্ত্রীকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম। খানিকটা দূরে চলে আসার পর সিদ্ধার্থদা বললেন, সন্তু, একবার দেওগির গিয়ে দেখবে নাকি? সুচা সিং-এর বউকে বেশ সরল মনে হলো, বোধহয় মিথ্যে কথা বলেনি।

—পুলিশের কাছে জানাবেন না?

—হ্যাঁ, জানাবো। ওরা যদি গা না করে আমরা নিজেরাই গিয়ে দেখে আসবো একবার।

আবার আমরা থানায় গেলাম। পুলিশের লোকেরা সব শুনে বললেন, আপনারা এত ধৈর্য হারাচ্ছেন কেন? আজ সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখুন। মীর্জা আলি বললেন, সুচা সিংকে কালকেই আপনাদের সামনে হাজির করাবো, কোনো চিন্তা নেই। গুরুবচন সিং বললেন, কী খোকাবাবু, আংকল-এর জন্য মন কেমন করছে?

থানা থেকে বেরিয়ে এসে সিদ্ধার্থদা বললেন, চল আমরা নিজেরাই যাই। একটা গাড়ি ভাড়া করতে হবে।

কিছুতেই আর গাড়ি পাওয়া যায় না। এখন পুরো সীজন-এর সময়, গাড়ির খুব টানাটানি। শেষ পর্যন্ত একটা গাড়ি পাওয়া গেল, কিন্তু সেটা আমাদের নামিয়ে দিয়েই চলে আসবে। সিদ্ধার্থদা এত ব্যস্ত হয়ে গেছেন যে তাতেই রাজী হয়ে গেলেন। আমাকে বললেন, ফেরার সময় যা হোক একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবেই! কী বলো, সন্তু?

দেওগির গ্রামের কাছাকাছি বড় রাস্তায় আমরা গাড়িটা ছেড়ে দিলাম। জায়গাটা ভীষণ নির্জন। রাস্তায় একটাও মানুষ নেই। রাস্তার দু পাশে ঘন গাছপালা। ফুল ফুটে আছে অজস্র। ময়না আর বুলবুলি পাখি উড়ে যাচ্ছে ঝাঁক বেঁধে। কাছ দিয়েই বয়ে যাচ্ছে একটা সরু ঝর্ণা, তার জলের কুলকুল শব্দ শোনা যায় একটানা।

দুজনে মিলে হাঁটতে লাগলাম কিছুক্ষণ। সুচা সিং-এর বাড়িটা কী করে খুঁজে পাওয়া যাবে বুঝতে পারছি না। কারুকে জিগ্যেস করারও উপায় নেই। তবু আমার কেন যেন মনে হতে লাগলো, কাকাবাবু এখানেই কাছাকাছি কোথাও আছেন। এই রকম মনে হবার কোনো মানে নেই। তবু এক এক সময় মনে হয় না? সিদ্ধার্থদা আর আমি দুজনে রাস্তার দু দিক দেখতে দেখতে হাঁটছি। খানিকটা বাদে হঠাৎ আমি রাস্তার পাশে একটা জিনিস দেখে ছুটে গেলাম। কাকাবাবুর একটা ক্রাচ পড়ে আছে। আমার শরীরটা কী রকম দুর্বল হয়ে গেল, চোখ জ্বালা করে উঠলো। কাকাবাবু তো ক্রাচ ছাড়া কোথাও যান না। এটা এখানে পড়ে কেন? তাহলে কি কাকাবাবুকে ওরা...

সিদ্ধার্থদা সেটা দেখে বললেন, এটা তো অন্য কারুরও হতে পারে। ক্রাচ তো এক রকমই হয়। সন্তু, তুমি ঠিক চিনতে পারছো?

—হ্যাঁ, সিদ্ধার্থদা। কোনো ভুল নেই। এই যে মাঝখানটায়

খানিকটা ঘষটানো দাগ ? সিদ্ধার্থদা, কী হবে ?

—আরে, তুমি আগেই ভয় পাচ্ছো কেন ? পুরুষ মানুষের অত দুর্বল হতে নেই। শেষ না-দেখা পর্যন্ত কোনো জিনিস মেনে নেবে না। একখানা ক্রাচ পড়ে আছে, আর একটা কোথায় গেল ?

আর একটা কাছাকাছি কোথাও পাওয়া গেল না। সিদ্ধার্থদা সেটাকে তুলে হাতে রাখলেন। তারপর বললেন, আর একটা ব্যাপারও হতে পারে। কাকাবাবু হয়তো ইচ্ছে করেই এটা ফেলে দিয়েছেন—চিহ্ন রাখবার জন্য। ওঁর খোঁজে যদি কেউ আসে, তাহলে এটা দেখে বুঝতে পারবে। পাশ দিয়ে এই যে সরু রাস্তাটা গেছে, চলো এইটা দিয়ে গিয়ে দেখা যাক্।

সেই রাস্তাটা দিয়ে একটু দূরে যেতেই একটা বাড়ি চোখে পড়লো। দোতলা কাঠের বাড়ি। কোনো মনুষ্যজন দেখা যাচ্ছে না। সাবধানে আমরা এগোলাম বাড়িটার দিকে। সিদ্ধার্থদা খুব সাবধানে তাকাচ্ছেন চারদিকে। হঠাৎ আমার কাঁধ চেপে ধরে সিদ্ধার্থদা বললেন, ঐ দ্যাখো বলেছিলুম, ঐ যে আর একটা ক্রাচ।

একটা গোলাপের ঝোপের পাশে দ্বিতীয় ক্রাচটা পড়ে আছে। সিদ্ধার্থদা সেটাও তুলে নিলেন। আর কোনো সন্দেহ নেই। ঠিক জায়গাতেই এসে গেছি।

সিদ্ধার্থদা মুখখানা কঠিন করে বললেন, হুঁ, একটা লোককে লুকিয়ে রাখার পক্ষে বেশ ভালো জায়গা ! কেউ টের পাবে না।

আমি ফিসফিস করে বললাম, সিদ্ধার্থদা, এখন ফিরে গিয়ে চট করে পুলিশ ডেকে আনলে হয় না ?

—এখন পুলিশ ডাকতে যাবো ? ততক্ষণে ওরা যদি পালায় ? এসেছি যখন, শেষ না দেখে যাবো না।

—কিন্তু ওরা যদি অনেক লোক থাকে ?

—তুমি ভয় পাচ্ছো নাকি সন্তু ?

—না, না, ভয় পাইনি—

—ক্রাচ দুটো দুজনের হাতে থাক। বেশ শক্ত আছে, দরকার হলে কাজে লাগবে।

কয়েকটা গাছের আড়ালে আমরা কিছুক্ষণ লুকিয়ে রইলাম। বাড়িটাতে একটাও মানুষ দেখা যাচ্ছে না। সোজা কাঠের সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। পাশাপাশি তিনখানা ঘর, তার মধ্যে ডানদিকের কোণের ঘরটা তালাবন্ধ। আমি বললাম, হয়তো সবাই এখান থেকে

আবার অন্য কোথাও চলে গেছে।

সিদ্ধার্থদা গম্ভীরভাবে বললেন, তা হতেও পারে। কিন্তু না দেখে তো যাওয়া যায় না।

—সিদ্ধার্থদা, প্রায় সন্ধে হয়ে আসছে। এরপর আমরা ফিরবোই বা কী করে ?

—সে ভাবনা পরে হবে। ফিরতে না পারি ফিরবো না। কনিষ্কর মাথাটা আমি একবার অন্তত দেখবোই।

একটু সন্ধে হতেই আমরা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলাম। এখনও কারুর দেখা নেই। পা টিপে টিপে উঠে গেলাম কাঠের সিঁড়ি দিয়ে। সিঁড়ির পাশের ঘরটাই তালাবন্ধ, পাশের জানলা দিয়ে ভেতরে উঁকি মারলাম। অন্ধকার, ভালো দেখা যায় না। মনে হলো যেন একটা চৌপাই-তে একজন মানুষ শুয়ে আছে। চোখে অন্ধকার একটু সয়ে যেতেই চিনতে পারলাম—কাকাবাবু !

সিদ্ধার্থদা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইশারায় বললেন, চুপ !

তারপর তালাটা নেড়েচেড়ে দেখলেন। তালাটা পেল্লায় বড়। সিদ্ধার্থদা বললেন, তালাটা বড় হলেও বেশী মজবুত নয়। সস্তা কোম্পানীর তৈরী। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, ওরা এরকম একটা বাজে তালা লাগিয়ে রেখেছে কেন ! বাড়িতেও আর কেউ নেই মনে হচ্ছে।

সিদ্ধার্থদা ক্রাচের সরু দিকটা ঢুকিয়ে দিলেন তালাটার মধ্যে। তারপর খুব জোরে একটা হ্যাঁচকা টান দিতেই তালাটা খুলে এলো।

সিদ্ধার্থদা বললেন, দেখে কি মনে হচ্ছে, আমার তালা ভাঙার প্র্যাকটিস আছে ? আমি কিন্তু জীবনে এই প্রথম তালা ভাঙলাম।

ততক্ষণে আমি দরজাটা ঠেলে খুলে ফেলেছি। ফিসফিস করে ডাকলাম, কাকাবাবু, কাকাবাবু !

সঙ্গে সঙ্গেই আমার মাথায় একটা প্রচণ্ড ধাক্কা লাগলো। আমি ছিটকে পড়লাম ঘরের মধ্যে। সিদ্ধার্থদাও পড়লেন এসে আমার পাশে। দড়াম করে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

সিদ্ধার্থদা প্রথম আঘাতটা সামলে নিয়েই চট করে উঠে দাঁড়ালেন। ছুটে গিয়ে টেনে দরজাটা খোলার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। দরজাটা ওপাশ থেকে কেউ টেনে ধরে আছে। একটু ফাঁকও হলো না। ধাক্কাধাক্কি করে নিরাশ হয়ে ফিরে এলেন সিদ্ধার্থদা।

কাকাবাবু ততক্ষণে উঠে বসেছেন। শূন্য দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, কে ? ঘরের মধ্যে আলো বেশী নেই, কিন্তু মানুষ চেনা

যায়। কাকাবাবু আমাদের চিনতে পারছেন না! কাকাবাবুকে কি ওরা অন্ধ করে দিয়েছে! পর মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম, কাকাবাবুর চোখে চশমা নেই। চশমা ছাড়া উনি অন্ধেরই মতন। আমি বললাম, কাকাবাবু, আমি সন্তু। আমার সঙ্গে সিদ্ধার্থদা—। কাকাবাবু শান্তভাবে বললেন, তোমরা আবার এরকম বিপদের ঝুঁকি নিলে কেন?

আমি দেখলাম কাকাবাবুর ডান হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ছুটে গিয়ে কাকাবাবুর পাশে দাঁড়ালাম। জিগ্যেস করলাম, তোমাকে মেরেছে ওরা?

কাকাবাবু বললেন, ও কিছু না। তোমরা নিজেরা না এসে পুলিশকে খবর দিলে পারতে। এরা বিপজ্জনক লোক।

সিদ্ধার্থদা বেশ জোরে চেঁচিয়ে বললেন, হ্যাঁ, আমরা পুলিশকে খবর দিয়েছি। পুলিশ আমাদের পেছন পেছনই আসছে।

জানলার বাইরে একটা হাসির আওয়াজ শোনা গেল। জানলায় দেখলাম সুচা সিং-এর বিরাট মুখ। সুচা সিং প্রথমেই বললেন...। না, বললেন না, বললো। ওকে আমি মোটেই আর আপনি বলবো না। একটা ডাকাত, গুণ্ডা! আমার কাকাবাবুকে মেরেছে!

সুচা সিং বললো, কী খোকাবাবু, তোমার বেশী লাগেনি তো? একটা ছোট্ট ধাক্কা দিয়েছি।

সিদ্ধার্থদা বললেন, আমার কিন্তু খুব জোরে লেগেছে। আমাকে কী দিয়ে মারলে? লাঠি দিয়ে? অতবড় চেহারাটা নিয়ে লুকিয়ে ছিলে কোথায়?

সুচা সিং বললো, এই ছোকরাটি কে খোকাবাবু? একে তো আগে দেখিনি।

আমি কিছু বলার আগেই সিদ্ধার্থদা বলে উঠলেন, আরো অনেককে দেখবে। পুলিশ আসছে একটু পরেই।

সুচা সিং আবার হেসে উঠলো। হাসতে হাসতে বললো, আসুক, আসুক! অনেক জায়গা আছে এ বাড়িতে। খানাপিনা করুন, আরামসে থাকুন, কই বাত নেই! রাত্তিরে শীত লাগলে কম্বল নিয়ে নেবেন— ঐ খাটের নিচে অনেক কম্বল আছে।

কাকাবাবু খাট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পায় পায় হেঁটে গেলেন জানলার দিকে। গম্ভীর ভাবে বললেন, সুচা সিং, আমার চশমাটা দাও! চশমা নিয়ে তোমাদের কি লাভ!

সুচা সিং খানিকটা অবাক হবার ভাব দেখিয়ে বললো, চশমা?

আপনার চশমা কোথায় তা আমি কি করে জানবো! হয়তো আসবার সময় কোথাও পড়েটড়ে গিয়ে থাকবে!

—না, তোমার লোক জোর করে আমার চশমা খুলে নিয়েছে।

—তাই নাকি! খুব অন্যায়!

—চশমাটা এনে দিতে বলো!

—সে তো এখন এখানে নেই! এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, আপনাকে তো এখন পড়ালিখা করতে হচ্ছে না!

কাকাবাবু হতাশ ভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আমার মনে হলো যেন কনিষ্কর মুণ্ডু কিংবা আর সবকিছুর থেকে চশমাটাই এখন ওর কাছে সবচেয়ে বড় কথা!

সিদ্ধার্থদা বললেন, পুলিশকে আমি এই জায়গাটার নাম বলে এসেছি। আজ হোক কাল হোক পুলিশ এখানে ঠিক এসে পড়বে।

সুচা সিং বললো, আসুক না! পুলিশকে আমি পরোয়া করি না!

কাকাবাবু বললেন, সুচা সিং, তুমি আমাদের শুধু শুধু আটকে রেখেছো। আমাদের ছেড়ে দাও।

—প্রোফেসারসাব, আপনাকে ছেড়ে দিতে কি আমার আপত্তি আছে? আপনাকে এক্ষুনি ছেড়ে দিতে পারি। আপনি আমার কথাটা শুনুন।

—তোমার ধারণা ভুল। আমি সোনার খবর জানি না।

—ঠিক আছে। এখন আপনার নিজের লোক এসে গেছে, বাতচিত করুন। দেখুন, যদি আপনার মত পাল্টায়—

—সুচা সিং, পাথরের মুণ্ডুটা আমার কাছে দিয়ে যাও। ওটা যেন কোনোরকমে নষ্ট না হয়। ওটা তোমার কোনো কাজে লাগবে না—

—ঠিক থাকবে, সব ঠিক থাকবে।

‘তোমাকে আমি ছাড়বো না!’

সুচা সিং জানলা থেকে সরে যাবার পর কাকাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, লোকটা পাগল হয়ে গেছে! একটা পাগলের জন্য আমার এত পরিশ্রম হয়তো নষ্ট হয়ে যাবে।

আমরা কাছে এসে কাকাবাবুর পাশে খাটের ওপর বসলাম। আমি জিগ্যেস করলাম, কাকাবাবু, তোমাকে কী করে নিয়ে এলো এখানে?

কাকাবাবু অদ্ভুত ভাবে হেসে বললেন, আমাকে ধরে আনা খুবই সহজ। আমি তো দৌড়োতেও পারি না, মারামারিও করতে পারি না। পোস্ট অফিসের দিকে যাচ্ছিলাম, একটা গাড়ি আসছিল আমার গা ঘেঁষে। দুটো লোক তার থেকে নেমে আমার পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ জোর করে চেপে ধরে গাড়িতে তুলে নিল। ঐখানে রাস্তাটা নির্জন, সকালে বিশেষ লোকও থাকে না—কেউ কিছু বুঝতে পারে নি। আমিও চ্যাঁচামেচি করিনি, তাতে কোনো লাভও হতো না—কারণ একজন আমার পাঁজরার কাছে একটা ছুরি চেপে ধরেছিল!

—গাড়িতে করে সোজা এখানে নিয়ে এলো?

—না। কাল সারাদিন রেখে দিয়েছিল ওদের গ্যারেজের পেছনে একটা ঘরে। সুচা সিং-এর বদ্ধমূল বিশ্বাস হয়ে গেছে, আমি কোনো গুপ্তধন কিংবা সোনার খনি আবিষ্কার করেছি। সেই যে কাঠের বাক্সটা ওকে দেখতে দিইনি, তাতেই ওর সন্দেহ হয়েছে। এমনিতে ও আমার সঙ্গে বিশেষ কিছু খারাপ ব্যবহার করেনি, শুধু বারবার এক কথা—ওকে আমি গুপ্তধনের সন্ধান বলে দিলে ও আমাকে আধা বখরা দেবে।

সিদ্ধার্থদা জিগ্যেস করলেন, আপনার হাতে লাগলো কী করে?

—একবার শুধু ওর একজন সঙ্গী আমার হাতে গরম লোহার ছ্যাঁকা দিয়ে দিয়েছে। সুচা সিং বলেছিল কাছে এনে ভয় দেখাতে, লোকটা সত্যি সত্যি ছ্যাঁকা লাগিয়ে দিল। সুচা সিং তখন বকলো লোকটাকে। সুচা সিং আমার ওপর ঠিক অত্যাচার করতে চায় না। ওর কায়দা হচ্ছে, ভালো ব্যবহার করে আমাকে বশে আনা, ভোরবেলা আমাকে নিয়ে এসেছে এই বাড়িতে।

—কিন্তু আপনাদের তাঁবু লণ্ডভণ্ড করেও তো ও কিছুই খুঁজে পায়নি। পাথরের মূর্তিটা দেখে ও তো কিছুই বুঝবে না। তাহলে এখনও আটকে রেখেছে কেন?

—বললাম না, ও পাগলের মতন ব্যবহার করছে। মুণ্ডুটার ভেতর দিকে কতকগুলো অক্ষর লেখা আছে। ওর ধারণা ওর মধ্যেই আছে গুপ্তধনের সন্ধান। সিনেমা-টিনেমায় যে রকম দেখা যায় অনেক সময়! বিশেষত, মূর্তিটার জন্য আমার এত ব্যাকুলতাই ওর প্রধান সন্দেহের কারণ। আমার সামনে ও মুণ্ডুটা আছাড় মেরে ভেঙে ফেলতে গিয়েছিল, আমি ওর পা জড়িয়ে ধরেছিলাম!

সিদ্ধার্থদা বললেন, ও যদি মুণ্ডুটার কোনো ক্ষতি করে, আমি

ওকে খুন করে ফেলবো!

কাকাবাবু বললেন, ওকে দমন করার কোনো সাধ্য আমাদের নেই। ওর সঙ্গে আরও দুজন লোক আছে।

সিদ্ধার্থদা জানালার কাছে গিয়ে শিকগুলো পরীক্ষা করে দেখলেন। তারপর বললেন, জানালাটা ভাঙা বোধহয় খুব শক্ত হবে না। আমরা চেষ্টা করলে এখান থেকে পালাতে পারি।

কাকাবাবু বিষণ্ণ ভাবে বললেন, ঐ মুণ্ডুটা ফেলে আমি কিছুতেই যাবো না। তার বদলে আমি মরতেও রাজী আছি। তোমরা বরং যাও—

কাকাবাবুকে ফেলে যে আমরা কেউ যাবো না, তা তো বোঝাই যায়। সিদ্ধার্থদা ওভারকোট খুলে ভালো করে বসলেন। স্নিগ্ধাদি আর রিণি এতক্ষণে শ্রীনগরে পৌঁছে নিশ্চয়ই খুব দুশ্চিন্তা করছে। আমরা কবে এখান থেকে ছাড়া পাবো, ঠিক নেই। কিংবা কোনো দিন ছাড়া পাবো কি না—

একটু রাত হলে সুচা সিং দরজা খুলে ঘরে ঢুকলো। তার সঙ্গে আরও দুজন লোক। একজনের হাতে একটা মস্ত বড় ছুরি, অন্যজনের হাতে খাবারদাবার। সুচা সিং বললো, কী প্রোফেসারসাব, মত বদলালো?

কাকাবাবু হাত জোড় করে বললেন, সিংজী, তোমাকে সত্যিই বলছি, আমি কোনো গুপ্তধনের খবর জানি না!

সুচা সিং ঠোঁট বাঁকিয়ে হেসে বললো, আপনারা বাঙালীরা বড্ড ধড়িবাজ! এত টাকা পয়সা খরচ করে, এত কষ্ট করে আপনি শুধু ঐ মুণ্ডুটা খুঁজতে এসেছিলেন? এই কথা আমি বিশ্বাস করবো?

—ওটার জন্য আসিনি। এমনি হঠাৎ পেয়ে গেলাম।

—ঠিক আছে, ওটা কোথায় পেয়েছেন, সে কথা আমাকে বলুন। ওটা কীসের মুণ্ডু? কোনো দেওতার মুণ্ডু? আপনারা যেখানে গিয়েছিলেন, সেখানে কোনো মন্দির নেই, আমি খোঁজ নিয়েছি। ওখানে পাথরের মুণ্ডু এলো কোথা থেকে? বাকি মূর্তিটা কোথায়? বলুন সে কথা!

ওকে কিছুতেই বোঝানো যাবে না ভেবে কাকাবাবু চুপ করলেন। সিদ্ধার্থদা তেজের সঙ্গে বললেন, আমরা ওটা যেখানে পাই না কেন? তার জন্য তুমি আমাদের আটকে রাখবে? দেশে আইন নেই? পুলিশের হাত থেকে তুমি বাঁচতে পারবে?

সুচা সিং-এর সঙ্গী ছুরিটা উঁচু করলো। সুচা সিং তাকে হাত দিয়ে বারণ করে বললো, আমাকে পুলিশের ভয় দেখিও না। চুপচাপ থাকো। তোমার মতন ছোকরাকে আমি এক রদ্দা দিয়ে কাৎ করে দিতে পারি! যদি ভালো চাও তো চুপচাপ থাকো! আমি শুধু প্রোফেসারের সঙ্গে কথা বলছি!

কাকাবাবু বললেন, আমার আর কিছু বলার নেই!

খাবার রেখে ওরা চলে গেল। আমাদের বেশ খিদে পেয়েছিল। সিদ্ধার্থদা ঢাকনাগুলো খুলে চমকে গিয়ে বললেন, আরে, বাস্! খাবারগুলো তো দারুণ দিয়েছে! বন্দী করে রেখে কেউ এরকম খাবার দেয় কখনো শুনিনি!

বড় বড় বাটিতে করে বিরিয়ানি, ডিম ভাজা, মুরগীর মাংস, চিঁড়ের পায়েস রাখা আছে। কাকাবাবু ঠিকই বলেছিলেন। আমাদের ভালো ভালো খাবার দিয়ে ভুলিয়ে ও কাকাবাবুকে দলে টানতে চাইছে। সেইসব খাবার দেখেই আমার খিদে বেড়ে গেল। সিদ্ধার্থদা তিন-জনের জন্য ভাগ করে দিলেন। আমি সবে মুখে তুলতে গেছি, সিদ্ধার্থদা বললেন, খাচ্ছো কে, যদি বিষ মেশানো থাকে?

শুনেই আমি ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি হাত তুলে নিলাম। কাকাবাবু বললেন, সুচা সিং সে-রকম কিছু করবে বলে মনে হয় না। তবু সাবধানের মার নেই। তোমরা আগে খেয়ো না, আমি খেয়ে দেখছি প্রথমে। আমি বুড়ো মানুষ, আমি মরলেও ক্ষতি নেই!

সিদ্ধার্থদা হাসতে হাসতে বললেন, বিষ মেশানো থাক আর যাই থাক, এ রকম চমৎকার খাবার চোখের সামনে রেখে আমি না খেয়ে থাকতে পারবো না।

টপ করে একটা মাংস তুলে কামড় বসিয়ে সিদ্ধার্থদা বললেন, বাঃ, গ্র্যান্ড! এ রকম খাবার পেলে আমি অনেকদিন এখানে থাকতে রাজী আছি!

সত্যিই যদি আমাদের এখানে অনেকদিন থাকতে হয়, তাহলে স্নিগ্ধাদি আর রিণির কী হবে? সিদ্ধার্থদার যেন সেজন্য কোনো চিন্তাই নেই।

খাওয়াদাওয়া শেষ করে আমরা বিছানা পেতে ফেললাম। খাটের তলায় আট-দশটা কম্বল রাখা ছিল। কম্বলগুলো বেশ নোংরা, কিন্তু উপায় তো নেই।

অনেক রাত পর্যন্ত আমরা না ঘুমিয়ে বিছানায় শুয়ে এখান থেকে

উদ্ধার পাবার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করলাম। কিন্তু কোনো পথই পাওয়া গেল না। কনিষ্কর মুণ্ডুটা না পেলে কাকাবাবু কিছুতেই যাবেন না। সেটা সুচা সিং-এর কাছ থেকে কি করে উদ্ধার করা যাবে? বেশী কিছু করতে গেলে ও যদি মুণ্ডুটা ভেঙে ফেলে!

ভোরবেলা উঠেই সিদ্ধার্থদা বিছানার পাশে হাত বাড়িয়ে বললেন, কই, এখনো চা দেয়নি?

সকালবেলা বেড-টি খাওয়ার অভ্যেস, সিদ্ধার্থদা বোধহয় ভেবে-ছিলেন হোটেলের ঘরে শুয়ে আছেন। ধড়মড় করে উঠে বসে সিদ্ধার্থদা বললেন, ব্যাটারা আচ্ছা অভদ্র তো, এখনো চা দেয় না কেন? দরজার কাছে গিয়ে দুম দুম করে ধাক্কা দিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, কই হ্যায়? চা লে আও!

আমি বললাম, ওরা বোধহয় চা খায় না।

সিদ্ধার্থদা বললেন, নিশ্চয়ই খায়! পাঞ্জাবীরা বাঙালীদের মতনই চা খেতে খুব ভালোবাসে।

কিন্তু কারুর কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। চা তো দূরের কথা, সকালবেলা কেউ কোনো খাবারও দিতে এলো না। কাল রাত্তিরে অত খাইয়ে হঠাৎ আজ সকালবেলা এই ব্যবহার! ভাগ্যিস ঘরটার সঙ্গে একটা ছোট বাথরুম ছিল, নইলে আমাদের আরও অসুবিধে হতো।

সিদ্ধার্থদা খানিকটা বাদে ধৈর্য হারিয়ে শিক ধরে টানাটানি করছিলেন, এমন সময় একটা গাড়ি থামার আওয়াজ শোনা গেল। সিদ্ধার্থদা বললেন, নিশ্চয়ই পুলিশের গাড়ি। আমিও ছুটে গেলাম জানলার কাছে। কাকাবাবু নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন খাটে। সকাল থেকে কাকাবাবু একটাও কথা বলেননি।

আমাদের নিরাশ করে গাড়ি থেকে নামলো সুচা সিং আর একটা লোক। সুচা সিং একা গট গট করে উঠে এলো ওপরে। তার হাতে সেই মহামূল্যবান কাঠের বাক্সটা।

সিদ্ধার্থদা হালকা ভাবে বললেন, কী সিংজী, সকালবেলা কোথায় গিয়েছিলে? আমাদের চা খাওয়ালে না?

সুচা সিং কঠোরভাবে বললো, জানলাসে হঠ্ যাও! আমি প্রোফেসারের সঙ্গে কথা বলবো!

কাকাবাবু তখনও খাটে বসে আছেন। সুচা সিং আমার দিকে তাকিয়ে বললো, এই যে খোকাবাবু, তোমার আংকেলের চশমাটা

[illegible]! দেখুন প্রোফেসারসাব, আপনি যা চাইছেন, তাই দিচ্ছি! এবার আমার কথা শুনবেন!

চশমাটা পেয়ে কাকাবাবু স্পষ্টভাবে খুশী হয়ে উঠলেন। বললেন, সুচা সিং, তোমার সঙ্গে আমাদের তো কোনো ঝগড়া নেই। তুমি আমাদের ছেড়ে দাও। আমরা পুলিশকে কিছু জানাবো না তোমার নামে। আমি কথা দিচ্ছি!

সুচা সিং বিরক্ত ভাবে বললো, এক কথা বারবার বলতে আমি পছন্দ করি না! আমি পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি, এর মধ্যে ঠিক করুন, আমার কথা শুনবেন কি না!

সিদ্ধার্থদা বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি ঘরের মধ্যে এসে বসুন, আমরা এ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করবো।

সুচা সিং প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে বললো, চোপ! তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না!

তারপর সে কাঠের বাক্স খুলে কনিষ্কর মুখটা দু আঙুলে তুলে উঁচু করে বললো, কী প্রোফেসারসাব, কিছু ঠিক করলেন?

কাকাবাবু পাথরের মুখটার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, সিংজী, ঈশ্বরের নামে অনুরোধ করছি, তুমি ওটাকে ও ভাবে ধরো না। সাবধানে ধরো। ওটা ভেঙে গেলে আমার জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে!

—বটে! বটে! এটার তাহলে অনেক দাম!

—সিংজী, তুমি ওটা ফেরত দাও, তোমাকে তার বদলে আমি পাঁচ হাজার টাকা দেবো। তার বেশী দেবার সামর্থ্য আমার নেই।

—পাঁচ হাজার? একটা পাথরের মুণ্ডুর দাম পাঁচ হাজার! এ রকম পাথরকা চীজ তো হামেশা পাওয়া যায়। আপনি পাঁচ হাজার রুপিয়া দিতে চাইছেন! তাহলে এক লাখ রুপিয়ার কম আমি ছাড়বো না!

—এক লাখ টাকা আমার নেই, থাকলে দিতাম। ও মূর্তিটার বাজারে কোনো দাম নেই। আমার কাছেই শুধু ওর দাম।

—ওসব চালাকি ছাড়ুন। খাঁটি কথাটা কী, বলুন!

সিদ্ধার্থদা জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে খপ্ করে পাথরের মুখটা চেপে ধরলেন। তারপর বললেন, ছাড়বো না, কিছুতেই ছাড়বো না।

কাকাবাবু ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, সিদ্ধার্থ ছেড়ে দাও, শিগগির ছেড়ে দাও! ভেঙে যাবে! ওটা তবু ওর কাছেই থাকুক!

সুচা সিং দু হাতে চেপে ধরেছে সিদ্ধার্থদার হাত। আস্তে আস্তে

পাথরের মুখটা ছাড়িয়ে নিয়ে কাঠের বাক্সে রাখলো। সাধারণ মানুষের মুখের চেয়ে দেড় গুণ বড় কনিষ্কর মুখটা। বেশ ভারী। কিন্তু সুচা সিং অনায়াসেই হাল্কা বলের মতন সেটা বাঁ হাতে ধরে মাটিতে রাখলো। তারপর সিদ্ধার্থদার হাতটা ধরে মোচড়াতে লাগলো। সিদ্ধার্থদা যন্ত্রণায় মুখ কুঁচকে ফেললেন। হাতটা বোধহয় ভেঙেই যাবে। আমি কাঁদো-কাঁদো মুখে সুচা সিংকে অনুরোধ করলাম, ছেড়ে দিন! ওঁকে ছেড়ে দিন! আর কখনো এ রকম করবে না—

সুচা সিং ঠোঁট বেঁকিয়ে বললো, বেতমীজ! আমার সঙ্গে জোর দেখাতে যায়! খুলে নেবো হাতখানা?

যন্ত্রণায় সিদ্ধার্থদার মুখ কুঁকড়ে যাচ্ছে, কিন্তু গলা দিয়ে একটা আওয়াজ বার করলেন না। শেষ পর্যন্ত সুচা সিং এক ধাক্কা দিয়ে সিদ্ধার্থদাকে মেঝেতে ফেলে দিল। তারপর কর্কশ গলায় বললো, প্রোফেসার, শুনলে না আমার কথা। তাহলে থাকো এখানে! আমি জম্মুতে চললাম, ওখানে আমার এক দোস্ত্ পাথরের দোকানদার, তাকে দেখাবো জিনিসটা! তোমাদের মারবো না—কাল আমার লোক এসে তোমাদের ছেড়ে দেবে।

সুচা সিং গটমট করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে গাড়িটাতে উঠলো। কাকাবাবুও নেমে এসে জানলার পাশে দাঁড়িয়েছেন। গাড়িটা ছাড়ার পর সুচা সিং আমাদের দিকে তাকিয়ে দাঁত বার করে হাসলো। তারপর চলে গেল হুশ করে!

গাড়িটা চলে যাওয়া মাত্র কাকাবাবু অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সিদ্ধার্থদার পাশে বসে পড়ে ব্যাকুলভাবে জিগ্যেস করলেন, সিদ্ধার্থ, তোমার হাত ভাঙেনি তো?

সিদ্ধার্থদা উঠে বসে বললেন, না, ভাঙেনি বোধহয় শেষ পর্যন্ত! শয়তানটাকে আমি শেষ পর্যন্ত শিক্ষা দেবোই। এর প্রতিশোধ যদি না নিই—

—শোনো, এখন এক মিনিটও সময় নষ্ট করার উপায় নেই। শিগগির ওঠো! দরজা ভাঙতে হবে—

কাকাবাবু নিজেই খোঁড়া পা নিয়ে ছুটে গিয়ে দরজার গায়ে জোরে ধাক্কা দিলেন। পুরু কাঠের দরজা—কেঁপে উঠলো শুধু। সিদ্ধার্থদা উঠে এসে বললেন, কাকাবাবু, আপনি সরুন, আমি দেখছি!

—না, না, এসো, আমরা তিনজনে মিলেই এক সঙ্গে ধাক্কা দিই—

সিদ্ধার্থদার দেখাদেখি আমিও অনেকটা ছুটে গিয়ে ধাক্কা দিলাম

দরজায়। প্রত্যেকবার শব্দ হচ্ছে প্রচণ্ড জোরে। কাকাবাবু বললেন, হোক শব্দ, তাই শুনে যদি কেউ আসে তো ভালোই!

কেউ এলো না। আমরা পর পর ধাক্কা দিয়ে যেতে লাগলাম। বেশ খানিকটা বাদে একটা পাল্লায় একটু ফাটল দেখা দিল, তাই দেখে আমাদের উৎসাহ হয়ে গেল দ্বিগুণ। শেষ পর্যন্ত যে আমরা দরজাটা ভেঙে ফেলতে পারলাম, সেটা শুধু গায়ের জোরে নয়, মনের জোরে।

ঘর থেকে বেরিয়েই কাকাবাবু বললেন, আমি দৌড়োতে পারবো না, তোমরা দুজন দৌড়ে যাও। বড় রাস্তায় গিয়ে যে-কোনো একটা গাড়ি থামাবার চেষ্টা করো! যে-কোন উপায়ে থামানো চাই। আমি আসছি। পরে—

প্রথমে একটা প্রাইভেট গাড়িকে থামাবার চেষ্টা করলাম। কিছুতেই থামলো না। আর একটু হলে আমাদের চাপা দিয়ে চলে যেত। তারপর একটা বাস। এখানকার বাস মাঝরাস্তায় কিছুতেই থামে না। বেশ কিছুক্ষণ আর কোনো গাড়ি নেই। ততক্ষণে কাকাবাবু এসে পৌঁছেছেন। এবার দূর থেকে একটা জিপ আসতে দেখা গেল। কাকাবাবু বললেন, এসো, সবাই মিলে রাস্তার মাঝখানে পাশাপাশি দাঁড়াই। এটাকে থামাতেই হবে।

জিপটা প্রচণ্ড জোরে হর্ণ দিতে দিতে কাছাকাছি এসে গেল। সিদ্ধার্থদা হতাশ ভাবে বললেন, এটা মিলিটারির জিপ। এরা কিছুতেই থামে না।

কাকাবাবু জোর দিয়ে বললেন, থামাতেই হবে। না হলে চাপা দেয় দিক!

জিপটা আমাদের একেবারে সামনে এসে থেমে গেল। একজন অফিসার রুক্ষভাবে বললেন, হোয়াট্‌স দা ম্যাটার জেণ্টেলমেন?

কাকাবাবু এগিয়ে গেলেন। অফিসারটির পোশাকের চিহ্ন দেখে বললেন, আপনি তো একজন করনেল? শুনুন করনেল, আপনাকে আমাদের সাহায্য করতেই হবে। একটুও সময় নেই!

তারপর কাকাবাবু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝিয়ে দিলেন, মনোযোগ দিয়ে শুনলেন করনেল। তারপর বললেন, হুঁ, বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার কিছু করার নেই। আমাকে জরুরী কাজে যেতে হচ্ছে।

কাকাবাবু গাড়ির সামনে পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে বললেন, যতই জরুরী কাজ থাক, আপনাকে যেতেই হবে।

কাকাবাবু গভর্নমেণ্টের এক গাদা বড় বড় অফিসার, মিলিটারির অফিসারের নাম বললেন। করনেল বললেন, আপনি ওসব যতই নাম বলুন, আমার মিলিটারি ডিউটির সময় আমি অন্য কারুর কথা শুনতে বাধ্য নই।

কাকাবাবু হাত জোড় করে বললেন, মিলিটারি হিসেবে নয়, আপনাকে আমার দেশের একজন মানুষ হিসেবে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি!

করনেল একটুক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে বসে রইলেন। তারপর বললেন, ঠিক আছে, গেট ইন্!

আমরা উঠে পড়তেই গাড়ি চললো ফুল স্পীডে। করনেল পুরো ব্যাপারটা আবার শুনলেন। তারপর বললেন, ইতিহাস সম্পর্কে আমারও ইণ্টারেস্ট আছে। সত্যি, এটা একটা মস্ত বড় আবিষ্কার। এটা নষ্ট হলে খুবই দুঃখের ব্যাপার হবে।

করনেলের নাম রণজিৎ দত্ত। বাঙালী নয়, পাঞ্জাবী। প্রথমে তিনি আমাদের নিতে রাজী হচ্ছিলেন না, পরে কিন্তু বেশ উৎসাহ পেয়ে গেলেন। ওঁর কাছেও এটা একটা অ্যাডভেঞ্চার।

গাড়ি এত জোরে যাচ্ছে যে হাওয়ায় কোনো কথা শোনা যাচ্ছে না। চেঁচিয়ে কথা বলতে হচ্ছে। করনেল বললেন, ওদের গাড়ি অনেক দূর চলে গেছে। পাহাড়ী রাস্তায় একটা মুশকিল, কোনো গাড়িকে ওভারটেক করা যায় না। মাঝখানে যে-সব গাড়ি পড়ছে তাদের পার হবো কী করে?

কাকাবাবু বললেন, উপায় একটা বার করতেই হবে।

সিদ্ধার্থদা বললেন, একটা উপায় আছে। উল্টো দিকের গাড়িকে পাশ দেবার জন্য মাঝে মাঝে যে কয়েক জায়গায় খানিকটা করে কাটা আছে—

করনেল দত্ত বললেন, হ্যাঁ, সেটা একটা হতে পারে বটে। অবশ্য, যদি মাঝখানের গাড়িগুলো জায়গা দেয়।

—আপনার মিলিটারির গাড়ি। আপনার গাড়ির হর্ণ শুনলে সবাই রাস্তা দেবে। আমাদের খুব ভাগ্য যে আপনাকে পেয়ে গেছি।

করনেল ড্রাইভারকে বললেন, সামনের গাড়ি দেখলেই দুবার করে জোরে হর্ণ দেবে। আপনারা মুচা সিং-এর গাড়ি চিনতে পারবেন তো?

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, হ্যাঁ, সাদা জীপ গাড়ি। নম্বরও আমি মুখস্থ করে রেখেছি।

সিদ্ধার্থদা আস্তে করে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়েই উঃ বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। ওঁর ডান হাতে সাঙ্ঘাতিক ব্যথা এখনো।

পাহাড়ী রাস্তা এঁকেবেঁকে চলেছে। রাস্তাটা ওপরে উঠে গেলে নিচের রাস্তা স্পষ্ট দেখা যায়। একটু বাদেই আমরা যখন পাহাড়ের ওপর দিকে উঠছি, পাহাড় পেরিয়ে নিচের দিকের রাস্তায় দেখতে পেলাম খেলনার মতন তিনটে গাড়ি। তার একটাকে বাস বলে চেনা যায়।

করনেল দূরবীন বার করলেন। আমাকে জিগ্যেস করলেন, গাড়ির নম্বরটা বলো তো, দেখি এর মধ্যে আছে কি না!

একটু দেখেই উত্তেজিত ভাবে বললেন, দ্যাটস ইট! ঐ তো সাদা জীপ!

আমরা সবাই উত্তেজনায় ছটফট করতে লাগলাম। এবার আর সুচা সিংকে কিছুতেই ছাড়া হবে না। কিন্তু পাহাড়ী রাস্তায় খুব জোরে তো গাড়ি চালানো যায় না, প্রত্যেক বাঁকে বাঁকে হর্ণ দিয়ে গতি কমিয়ে দিতে হয়। একদিকে অতলস্পর্শী খাদ, অন্যদিকে পাহাড়ের দেয়াল। খাদের নিচের দিকে তাকালে মাথা ঝিমঝিম করে। একটু আগে বৃষ্টি হয়েছে এক পশলা, ভিজে রাস্তা বেশী বিপজ্জনক।

কাকাবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, কী সুন্দর রামধনু উঠেছে দ্যাখো। এ পাশের সারাটা আকাশ জুড়ে আছে। অনেকদিন বাদে সম্পূর্ণ রামধনু দেখলাম—সাধারণত দেখা যায় না।

আমাদের চোখ নিচের রাস্তার সেই খেলনার মতন গাড়ির দিকে আবদ্ধ ছিল। সিদ্ধার্থদা অবাক হয়ে কাকাবাবুর দিকে ঘুরে জিগ্যেস করলেন, কাকাবাবু, আপনার এখন রামধনু দেখার মতন মনের অবস্থা আছে? আমি তো ধৈর্য রাখতে পারছি না।

কাকাবাবু শান্ত গলায় বললেন, মনকে বেশী চঞ্চল হতে দিতে নেই, তাতে কাজ নষ্ট হয়। দণ্ডকারণ্যে রাম যখন সীতাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন, সেই সময়ও তিনি পম্পা সরোবরের সৌন্দর্য দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন।

করনেল ড্রাইভারকে বললেন, বাসটা কাছাকাছি এসে গেছে। হর্ণ দাও! হর্ণ দাও—দু বার!

বাসটা সহজেই আমাদের পথ ছেড়ে দিল। কিন্তু তার পরের গাড়িটা আর কিছুতেই জায়গা দিতে চায় না। আমরা সেটার পেছন পেছন এসে অনবরত হর্ণ দিতে লাগলাম। মাইল দুয়েক বাদে রাস্তাটা

একটু চওড়া দেখেই বিপদের পুরো ঝুঁকি নিয়ে গাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে গেলাম। সেই গাড়িটাতে শুধু একজন ড্রাইভার, আর কেউ নেই। সিদ্ধার্থদা বললেন, ও গাড়ির ড্রাইভারটা বোধহয় কালা—আমাদের এত হর্ণ ও শুনতে পায়নি!

করনেল বললেন, কালা লোকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়া হয় না। কালা নয়, লোকটা পাজী।

এবার আমাদের ঠিক সামনে সুচা সিং-এর গাড়ি। বড় জোর সিকি মাইল দূরে। আমরা দেখতেও পাচ্ছি, গাড়িতে সুচা সিং আর তার একজন সঙ্গী বসে আছে। ওরাও নিশ্চয়ই দেখেছে আমাদের।

সিদ্ধার্থদা গাড়ির সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়াচ্ছেন প্রায়। ছটফট করে বললেন, ব্যাটার আর কোনো উপায় নেই, এবার ওকে ধরবোই।

আমাদের হর্ণে ও-গাড়ি কর্ণপাতও করলো না। দুটি গাড়ির মধ্যে ব্যবধান কমে আসছে একটু একটু করে। ওরা মরীয়া হয়ে জোরে চালাচ্ছে। সুচা সিং খুব ভালো ড্রাইভার—আমরা আগে দেখেছি।

করনেল বেল্ট থেকে রিভলবার বার করে বললেন, ও গাড়ির চাকায় গুলি করতে পারি। কিন্তু তাতে একটা ভয় আছে, গাড়িটা হঠাৎ উল্টে যেতে পারে।

কাকাবাবু আর্তনাদ করে উঠলেন, খবরদার, সে কাজও করবেন না। আমি সুচা সিংকে শাস্তি দিতে চাই না, আমি আমার জিনিসটা ফেরত চাই।

সিদ্ধার্থদা বললেন, আর বেশী জোর চালালে আমাদের গাড়িই উল্টে একেবারে ঝিলম নদীতে পড়বে। ঐ দ্যাখো, সন্তু, ঝিলম নদী!

আমি একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলাম। অত নিচে তাকালে আমার মাথা ঝিমঝিম করে।

আট দশ মাইল চললো দুই গাড়ির রেস। ক্রমশ আমরাই কাছে চলে আসছি। করনেল জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে খুব জোরে চিৎকার করে উঠলেন, হল্ট!

সুচা সিং মুখ ফিরিয়ে আমাদের দেখলো। কিন্তু গাড়ি থামালো না। কাকাবাবু বললেন, করনেল দত্ত, সাবধান! সুচা সিং-এর কাছে আমার রিভলবারটা আছে।

করনেল বললেন, মিলিটারির গাড়ি দেখেও গুলি চালাবে এমন সাহস এখানে কারুর নেই।

আর কয়েকমাইল গিয়েই ভাগ্য আমাদের পক্ষে এলো। দেখতে

গেলাম উল্টোদিক থেকে একটা কনভয় আসছে। এক সঙ্গে কুড়ি-পঁচিশটা লরি। সুচা সিং-এর আর উপায় নেই। কনভয়কে জায়গা দিতেই হবে, পাশ কাটিয়ে যাবার উপায় নেই।

করনেল তাঁর ড্রাইভারকে বললেন, আমাদের গাড়ির স্পীড কমিয়ে দাও। আগে দেখা যাক্—ও কী করে!

সুচা সিং-এর গাড়ির গতিও কমে এলো! এক জায়গায় ছোট একটা বাই পাস আছে, সেখানে গাড়ি ঘুরেই থেমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ওরা দুজনে গাড়ি থেকে নেমেই দু দিকে দৌড়েছে। কয়েক মুহূর্ত পরে, আমরাও গাড়ি থেকে নেমে ওদের দিকে ছুটে গেলাম। সুচা সিং-এর সঙ্গী প্রাণপণে দৌড়োচ্ছে উল্টো দিকের রাস্তায়। তার দিকে আমরা মনোযোগ দিলাম না। সুচা সিং পাহাড়ের খাঁজ দিয়ে দিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। এক হাতে সেই কাঠের বাক্স।

সিদ্ধার্থদাই আগে আগে যাচ্ছিলেন। সুচা সিং হঠাৎ রিভলবার তুলে বললো, এদিকে এলে জানে মেরে দেবো!

সিদ্ধার্থদা থমকে দাঁড়ালেন। আমরাও দাঁড়িয়ে পড়লাম। শুধু করনেল একটুও ভয় না পেয়ে গম্ভীর গলায় হুকুম দিলেন, এক্ষুনি তোমার পিস্তল ফেলে না দিলে মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো!

আমি তাকিয়ে দেখলাম, করনেলের হাতে রিভলবার ছাড়াও, ওঁর গাড়ি যিনি চালাচ্ছিলেন তাঁর হাতে একটা কী যেন কিম্ভূত চেহারার অস্ত্র। দেখলেই ভয় করে। সুচা সিং সেই দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে রিভলবারটা ফেলে দিল। কিন্তু তবু তার মুখে একটা অদ্ভুত ধরনের হাসি ফুটে উঠলো। কাঠের বাক্সটা উঁচু করে ধরে বললো, এটার কী হবে প্রোফেসারসাব? আমার কাছে কেউ এলে আমি এটা নিচে নদীতে ফেলে দেবো।

কাকাবাবু করনেলকে হাত দিয়ে বাধা দিয়ে বললেন, আর এগোবেন না। ও সত্যিই ফেলে দিতে পারে।

তারপর কাকাবাবু হাতজোড় করে বললেন, সুচা সিং, তোমাকে অনুরোধ করছি, ওটা ফিরিয়ে দাও!

সুচা সিং আর একটা পাথর ওপরে উঠে গিয়ে বললো, এটা আমি দেবো না। কিছুতেই দেবো না!

—ফিরিয়ে দাও সুচা সিং! গভর্নমেণ্টকে বলে তোমাকে আমি পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করবো। আমি নিজে তোমাকে পাঁচ হাজার টাকা দেবো বলেছি—
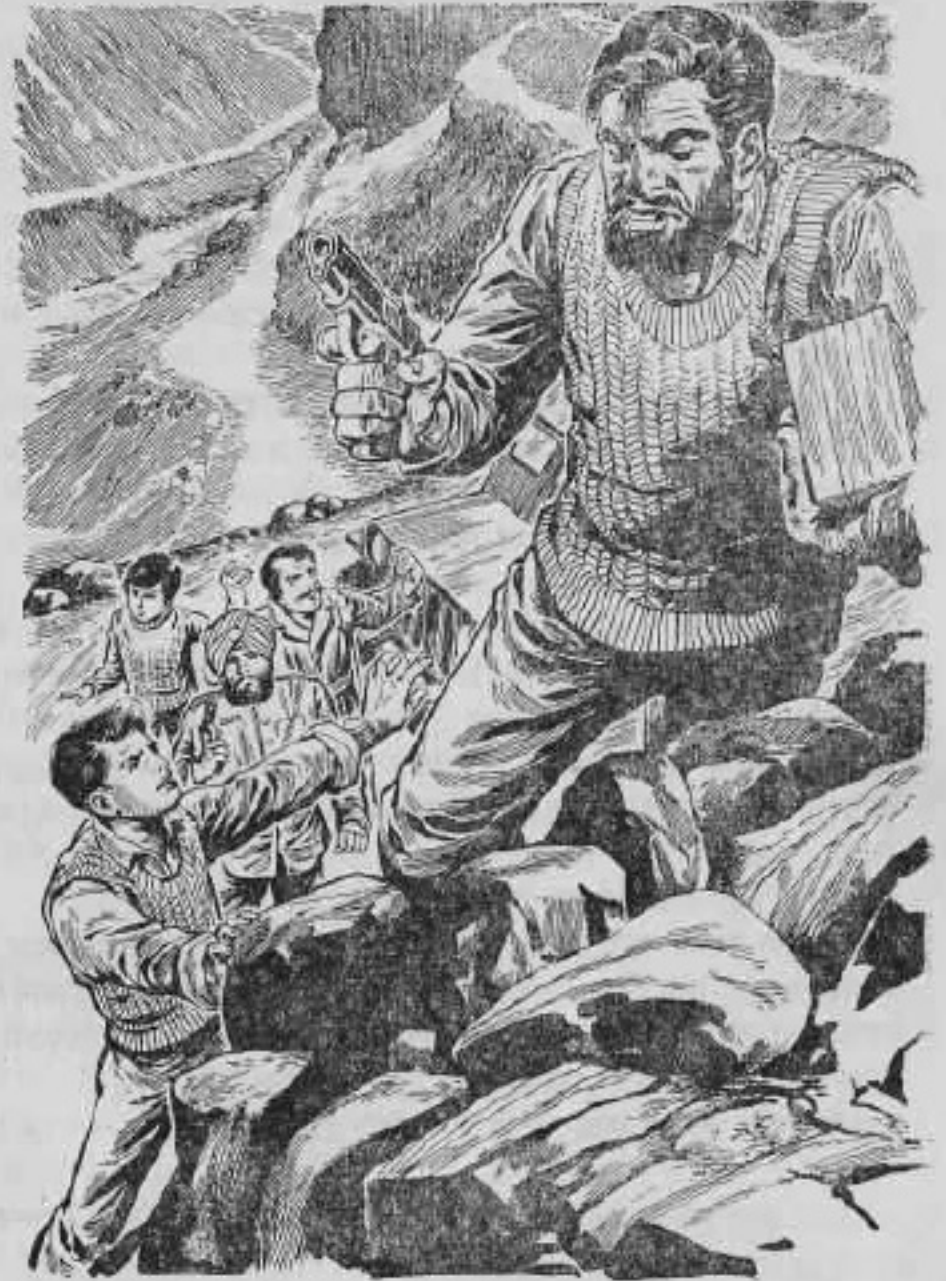
সুচা সিং হঠাৎ রিভলবার তুলে বলল, এদিকে এলে জানে মেরে দেবো।

—বিশ্বাস করি না। তোমরা মিলিটারি নিয়ে এসেছো। এটা ফিরিয়ে দিলেই তোমরা আমাকে ধরবে।

—না ধরবো না। তুমি বাক্সটা ওখানে পাথরের ওপর রেখে যাও। আমরা আধঘণ্টা আগে ছোঁবো না। তুমি চলে না গেলে—

—ওসব বাজে চালাকি ছাড়ো!

—না, সত্যি, বিশ্বাস করো, ঈশ্বরের নাম নিয়ে বলছি—সুচা সিং বাক্সটা হাতে নিয়ে দোলাতে লাগলো। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। হুকুমের সুরে বললো, তোমরা এক্ষুনি গাড়িতে ফিরে যাও! না হলে আমি এটা ঠিক ফেলে দেবো!

কাকাবাবু অসহায়ভাবে কর্নেলের দিকে তাকালেন। ভাঙা গলায় বললেন, কী করা উচিত বলুন তো? আমাদের বোধহয় ওর কথা মতন গাড়িতে ফিরে যাওয়াই উচিত! ও যদি ফিরে যায়—

কর্নেল বললেন, ওর কথা বিশ্বাস করা যায় না। ওদিকে হয়তো নেমে যাবার রাস্তা আছে। ও পালাবে।

কথার ফাঁকে ফাঁকে সিদ্ধার্থদা এক পা এক পা করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। কেউ লক্ষ্য করেনি। আস্তে আস্তে পাথরের খাঁজে পা দিয়ে সিদ্ধার্থদা একেবারে সুচা সিং-এর সামনে পৌঁছে গেলেন। বাক্সটা ধরার জন্য সিদ্ধার্থদা যেই হাত বাড়িয়েছেন, সুচা সিং ঠেলে দিতে গেল তাকে। তারপর মরীয়ার মতন বললো, যাক্, তাহলে আপদ যাক্!

সুচা সিং বাক্সটা ছুঁড়ে ফেলে দিল নিচে।

আমরা কয়েক মুহূর্তের জন্য দম বন্ধ করে রইলাম। কাকাবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন মাটিতে। সংগে সংগে অজ্ঞান। সিদ্ধার্থদা বাঘের মতন সুচা সিং-এর গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, তোমাকে আমি কিছুতেই ছাড়বো না।

ঝটাপটি করতে করতে দুজনেই পড়ে গেলেন পাথরের ওপাশে।

হোক ভয়ংকর, তবু সুন্দর

তারপর মাস তিনেক কেটে গেছে। কলকাতায় ফিরে এসেছি, এখন আবার স্কুলে যাই। সামনেই পরীক্ষা, খুব পড়াশুনো করতে হচ্ছে। অনেকদিন পড়াশুনো বাদ গেছে তো!

তবু প্রায়ই কাশ্মীরের সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। মনে

হয় স্বপ্নের মতন। গল্পের বইতে যে রকম পড়ি, সিনেমায় যে-রকম দেখি—আমার জীবনেও সে-রকম ঘটনা ঘটেছিল। অনেকেই বিশ্বাস করতে চায় না।

এক একবার ভাবি, সেই পাইথনটা গুহার একেবারে ভেতরের দিকে না থেকে যদি বাইরের দিকে থাকতো? যদি আমি পড়ে যাওয়া মাত্রই কামড়ে দিত? তাহলে এখন আমি কোথায় থাকতাম? সেই কথা ভেবে নতুন করে ভয় হয়। কিংবা তাঁবুর মধ্যে সুচা সিং-এর দলবল যখন আমার মুখ বেঁধে রেখেছিল, তখন ওরা তো আমাকে মেরে ফেলতেও পারতো!

কী সব ভয়ংকর দিনই গেছে। হোক ভয়ংকর, তবু কত সুন্দর। আমাকে যদি আবার ঐ রকম জায়গায় কেউ যেতে বলে, আমি এক্ষুনি রাজী! আবার ঐ রকম বিপদের মধ্যে পড়তে হলেও আমি ভয় পাবো না! ঐ ক'টা দিনের অভিজ্ঞতাতেই যেন আমি অনেক বড় হয়ে গেছি।

রিণি আমার ওপর খুব রেগে গেছে। আমরা ঐ রকম একটা অ্যাডভেঞ্চারে গিয়েছিলাম আর ওরা বসে ছিল শ্রীনগরে—এই জন্য ওর রাগ। কেন আমরা ওকে সঙ্গে নিইনি! আমি বলেছি, যা যা ভাগ্। তোকে সঙ্গে নিলে আরও কত বিপদ হতো তার ঠিক আছে! সুচা সিং-এর রাগী মুখ দেখলেই তুই অজ্ঞান হয়ে যেতিস! রিণি মন থেকে বানিয়ে বানিয়ে সুচা সিং-এর রাগী মুখের একটা ছবি এঁকেছে। সেটা মোটেই সুচা সিং-এর মতন দেখতে নয়, বক-রাক্ষসের মতন।

সিদ্ধার্থদার হাতে বুকে এখনও প্লাস্টার বাঁধা। সিদ্ধার্থদা পাহাড় থেকে অনেকখানি গড়িয়ে পড়েছিলেন সুচা সিং-কে সঙ্গে নিয়ে। সুচা সিং-এর দেহের ভারেই সিদ্ধার্থদার বুকের তিনটে পাঁজরা ভেঙে গিয়েছিল, আর ডান হাতটা ছেঁচে গিয়েছিল খানিকটা! সিদ্ধার্থদা এখন আস্তে আস্তে ভালো হয়ে উঠছেন। সিদ্ধার্থদার গর্ব এই, তবু তো তিনি একবার অন্তত সেই মহা মূল্যবান ঐতিহাসিক জিনিসটা ছুঁতে পেরেছিলেন।

সুচা সিং-ও বেঁচে গেছে। তারও চোয়ালের হাড় ভেঙে গেছে—এখন সে জেলে। সুচা সিং-এর ফুটফুটে ছেলেমেয়ে দুটির কথা ভেবে আমার কষ্ট হয়। ওরা যখন বড় হয়ে শুনবে, ওদের বাবা একজন ডাকাত, তখন কি ওদের খুব দুঃখ হবে না? চোর-ডাকাতের ছেলে-মেয়েরা নিশ্চয়ই খুব দুঃখী হয়।

কাকাবাবুও সেদিন খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ওঁকে তখন

ধরাধরি করে খুব সাবধানে নিয়ে আসা হয়েছিল কুদ নামে একটা জায়গায়। সেখানে একজন ডাক্তার পাওয়া গিয়েছিল ঠিক সময় মতন। কর্নেল দত্ত যে আমাদের কত সাহায্য করেছিলেন, তা বলে বোঝানো যায় না। কাকাবাবু অবশ্য দু' তিনদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন খানিকটা। তারপরই আবার সেই পাথরের মুখ খুঁজতে বেরিয়েছিলেন।

সুচা সিং যেখান থেকে বাক্সটা ছুঁড়ে দিয়েছিল, সেখান থেকে ওটা ঝিলম নদীতেই পড়ার কথা। কিন্তু তিনদিন ধরে ঝিলম নদীর অনেকখানি এলাকা জুড়ে খোঁজাখুঁজি করা হয়েছে, পাওয়া যায়নি। সেই পাহাড়টার সব জায়গাও তন্নতন্ন করে খোঁজা বাকী থাকেনি। অমন মূল্যবান জিনিসটা কোথায় যে গেল, কে জানে!

কাকাবাবু আমাকে বারণ করেছেন, ওটার কথা কারুকে বলতে। কারণ, এ রকম একটা ঐতিহাসিক ব্যাপারের সত্যি সত্যি প্রমাণ না পেলে কেউ বিশ্বাস করে না। আমার কিন্তু সবাইকে ডেকে ডেকে শোনাতে ইচ্ছে করে।

আমার এখনও ধারণা, কাঠের বাক্সটা সহজে ডুবে যাবে না। ঝিলম নদীর তীরে কোথাও না কোথাও একদিন ওটাকে আবার খুঁজে পাওয়া যাবে। সেদিন আমাদের কথা সবাই বিশ্বাস করবে।

—